সাগরের আতঙ্ক

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
হীরক রায়
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট, (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ;
নভেম্বর ; ১৯৬১

মুদ্রক :
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র নাথ স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

১৯৩১ সাল। মহাকাশ আর সমুদ্র গহ্বরে চলেছে খণ্ড খণ্ড অভিযান। প্রফেসর পিকার্ড বেলুনে চেপে দশ মাইল উঁচুতে উঠলেন। সময় থেমে রইলো না। এরপর ষ্টিভেন আর এ্যাণ্ডারসন বেলুনে করে পৃথিবী ছাড়িয়ে ১৪ মাইল ওপরে উঠলেন। তাঁরা যে স্তরে উঠলেন তাব নাম স্ট্রাটোস্‌ফিয়ার। ওখানে বাতাস বা মেঘ নেই। শুধু ঠাণ্ডার রাজত্ব। ঠিক তার আগের বছব উইলিয়াম বীব নামে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক ষ্টীলের একটা বল তৈরী করলেন। বলটা ফাঁপা। গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে ডুবানোর উপযোগী একটা বড় কঠিন আধার। নাম দিলেন ব্যাথিস্ফিয়ার। অক্সিজেন ভরে ব্যাথিস্ফিয়ারের সাহায্যে তিনি নামলেন সমুদ্র-গর্ভে। আধমাইলেরও বেশী অভ্যন্তরে গিয়ে অনুসন্ধান চালালেন। জানলায় চোখ রেখে সার্চ লাইটের সাহায্যে দেখলেন সাগর-গর্ভে বিভিন্ন রকম জীবনের অস্তিত্ব। ঠিক সেই সময় আমাদের এই ভারতবর্ষের গভীর সমুদ্রে ওঠে এক আলোড়ন সেটা ছড়িয়ে পড়ে আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে। আমার এই গল্পের কাহিণী সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনারই এক সমাবেশ। তবে আগার আগে থাকে গোড়া, যাকে উপরে ফেলে আগায় জল ঢালা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই প্রথমে গোড়ার কথাই পাড়ি।

॥ ২ ॥

আলেপ্পি। কেরালার একটা সুন্দর নগরী। সমুদ্রের ঠিক কাছেই। অদূরেই সার সার নারকেল গাছ। ঠিক যেন প্রহরী। এখানে সেখানে এলাচ আর দারুচিনির বাগান। এদের গন্ধে আলেপ্পি ভরপুর। মাঝে মাঝে

সবঙ্গবনে ঝড় উঠলে ফুলের মিষ্টি সুবাস ছুটে যায় দূর, দূরান্তে, সেখানে জেলেরা নৌকোয় চেপে মনের সুখে গায় বঞ্চিপাট্টু (গান) আর চীনেজাল দিয়ে মাছ ধরে। তাদের বঞ্চিপাট্টুর সঙ্গে সাগরের ঢেউ নূপুর বাজিয়ে, খলখল করে হাসতে হাসতে কথাকলি নাচ সুরু করে। দূরের আম, কাঁঠাল আর সুপুরিবনের মাঝ থেকে সিঁথিমৌর পর্বতশ্রেণী গলা বাড়িয়ে দেখে সেই নাচ, শোনে সাগরের গান।

তীর থেকে বেশ দূরে সাগরে মাছ ধরছে আলেপ্পীর জেলেরা। নৌকো-গুলো ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। কোনটার পাল তোলা। হাওয়ায় ফুলে উঠেছে ত্রিকোনাকৃতি পালের বুকটা; কারও বুক ফাঁকা পাল নেই। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন একটা ফ্রেমে আঁটা সুন্দর ছবি। জেলেদের কেউ ভাটিয়ালী ধরে দাঁড় টানছে, কেউ জাল তুলে ঝাড়ছে মাছ, কেউ হয়তো নতুন করে পাতছে জাল।

তিনবছরের ছোট্ট ছেলে তিরুনালকে নৌকোয় বসিয়ে দাঁড় টানছে পৃথন। মা-মরা ছেলে তিরুনাল। বাপের খুব আদুরে। কানে রূপোর মাকড়ি। দাগী করে দিয়েছে পৃথন ছেলেকে। তিরুকে বাড়ীতে ফেলে রেখে আসতে পৃথনের মন চায় না। মেয়ে নীলামনির বয়স মোটে বারো। স্কুলে পড়ে। দুবেলা রান্না করে। অবসর সময়ে নৌকোর তলায় মাছের তেল মাখায়। কখনও বা রং লাগায়। পাঁচ কাজের মানুষ নীলামণি। তাই তিরুকে আর তার ঘাড়ে চাপিয়ে সাগরে যেতে মন চায় না পৃথনের।

পৃথনের অবস্থা বেশ ভালই। তারা দুভাই। ছোটোর নাম উন্নি। উন্নি অবশ্য বৈমাত্রেয় ভাই। ওরা পৃথক। পৃথন ভাই উন্নিকে আলাদা করে দিতে চায়নি, কিন্তু উন্নি আর উন্নির বউ পুন্নন একযোগে আগুন লাগিয়ে দিল সংসারে। রোজ রোজ ঝগড়ার। আর ঝগড়ার কারণ সেই এক,—জমি-জায়গা আর ছোট ছেলেমেয়ে। উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে পৃথন রোজগার করে ভালই। কিন্তু উন্নি কুড়ের বাদশা। খেটে খেতে গেলেই তার যত কষ্ট। এর ওপর দিনরাত আড্ডা আর আড্ডা। দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে সব উড়িয়ে দেয়। পৃথন অনেক বলল, কিন্তু উন্নি শুনল'না। একভাবেই চললো। তখন পৃথন টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল। ঝগড়াটে পুন্নন স্বামীকে তাতাতে লাগল, পৃথন সম্পত্তির আয় একাই ভোগ করছে। হিংসুটে উন্নির বুক জ্বলতে লাগল।

ছেলে নিয়েও গণ্ডগোল। তিরু খুব দুরন্ত। চেহারা মোটাসোটা, গোল-গাল। গায়ে বেশ জোর। এই তিরুর সঙ্গে উন্নির ছেলে কৃষ্ণনের প্রায় খুঁটুর-মুটুর লেগেই থাকত। অবশ্য তাই হয়। ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি হয়েই থাকে। পৃথন এসব কথা কানে তুলত না। কিন্তু উন্নি খল। আড্ডা থেকে ফিরে এলে পুন্নন সেই তিলকে তাল করে দেখাত, উন্নির মাথা খারাপ হয়ে যেত। তিরুকে চড়-চাপড় দিত, পৃথনের সঙ্গে ঝগড়া করত মেয়েছেলের মতো কোমর বেঁধে। অশান্তি ভাল লাগল না পৃথনের। পৃথক হল। জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর, নৌকো সব ভাগাভাগি হল।

পৃথন পরিশ্রমী। সে দিনরাত খেটে সব কিছু বাড়িয়ে চলল। একটা নৌকো থেকে করল চারটে নৌকো, জমি-জায়গা কিনল আর উন্নি আস্তে আস্তে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগল। ফল হল আরও খারাপ। পৃথনের উন্নতি আর নিজের পতনের কথা ভেবে উন্নির মন ইর্ষায় জলে-পুড়ে যেতে লাগলো। দিনরাত সে পৃথনের অমঙ্গল কামনা করে মন্দিরে মন্দিরে ধারণা দেয়। ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ালে এই রকমই হয়।

দস্যি ছেলে তিরুনাল। তিন বছরের ছেলে হলে হবে কি পাড়া মাত করে রাখে এই বয়েসেই। দিদি লীলামণির হাত ধরে এপাড়া ওপাড়া করে, ওত্তম তুল্লোল (দৌড়লাফ নৃত্য) দেখে লাফালাফি সুরু করে, কুকুরের লেজ ধরে টানে, পাখি দেখলেই 'আয় আয়' করে ডাকে। তবে জল দেখলেই তিরুনাল কেমন যেন হয়ে যায়। দিদির সঙ্গে খালের জলে নেমে কিছুতেই উঠতে চাইবে না, ডুব দিয়ে সহজে উঠবে না। বিশেষ করে সাগরে বাবার সঙ্গে চান করতে নামলে ওর কি স্ফূর্তি। কল কল শব্দ করে আরবসাগরের জল যখন ছুটে আসে ওর দিকে, ও তখন খলখল করে হেসে ঢেউ ধরতে যায়। পৃথন কিছুতেই ওকে আটকে রাখতে পারে না। চোট্ট ছুটো কচি হাত নিয়ে বাপের সঙ্গে লড়াই সুরু করে দেয় তিরুনাল। না পারলে কান্না সুরু করে, বায়না ধরে ঢেউ ধরবে বলে। তিরুর জলের ওপর টান দেখে পৃথনের মনে দারুণ চিন্তা। সেইজন্যেই মাছ ধরতে সাগরে নামলে তিরুকে সঙ্গে নিয়ে যায় পৃথন। লীলামনির কাছে রেখে যেতে ভয় হয়। ভয় পৃথনের নিজের রক্তকেও। ওরা শুধু জেলে নয়, ডুবুরীও। তাই বাপ-ঠাকুর্দার মতো তিরুরও সাগরের ওপর টান বেশী।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দাঁড় টানছে পৃথন। চোখের সামনে তিরুনাল।

কখনও মাছ ঘাঁটছে, কখনও বা একহাতে ইডলী ধরে চিবুচ্ছে। তবে বেশীর ভাগ সময়েই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সাগরের লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের দিকে। জল আর জল। তিরুনালের স্বপ্নের রাজত্বে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ঢেউ ধরতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পৃথন চিৎকার করে, এই তিরু। ঝুঁকিসনে। সরে বস।

সরে বসে তিরুনাল। কিন্তু মন টানে সাগরের বড় বড় প্রাণচঞ্চল ঢেউগুলো। তিরুর কাছে ওরা জীবন্ত। এক একটা ঢেউ এক একটা চঞ্চল, দস্যি ছেলে। কেমন সাঁতার কেটে এখানে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে। তিরুনাল ভাবে ওরা ওকে খেলা করতে ডাকছে। কিন্তু যেতে পারে না সে। হাত বাড়ালেই বাবার ধমকানি, এই তিরু, ঝুঁকিস নে। টুপ করে জলে পড়ে যাবি। বাবার ওপর তিরুর বড্ড রাগ হয়। তিরুর জন্যে পৃথনেরও বেশ ভয় হয়। মনে মনে ভাবে ছেলেটা সাগরে না ডুবে যায়।

দাঁড় টেনে আরও এগোতে থাকে পৃথন। তিরুনালেও আনন্দের সীমা নেই। পাল তুলে বেশ কখানা নৌকা এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঠিক যেন ছবি। তিরু বাবাকে বলে, বাবা, যাব।

দূরের পাল-তোলা নৌকাটার দিকে হাত দেখায় তিরু। পৃথন বলে, চুপ করে বস।

বাবা—, উ চল।

গান শোন তিরু। কি সুন্দর গান। কারু কাকা গাইছে।

কা-কা যাব।

যাচ্ছি যাচ্ছি। কি ছেলে রে বাবা। তুই বড্ড দুষ্টু।

বাবা—, দু-টটু যাব।

হাসিতে ফেটে পড়ে পৃথন। তিরুকে বুকে জড়িয়ে চুমুর পর চুমু খায়, আর বলে, তুই খু-উ-ব বোকা।

একটা পাল তোলা নৌকো এগিয়ে আসে। পৃথনের চোখ কিন্তু তিরুর ওপর। তিরুকে বুকে নিয়ে দাঁড় টানে পৃথন, আর মাঝে মাঝে আদর করে। হঠাৎ তিরুর দৃষ্টি যায় নৌকাটার দিকে। আনন্দে অধীর তিরুনাল বাবার এক হাতের বাঁধনে বুকের ওপর সদ্য তোলা টাটকা মাছের মত লাফালাফি জুড়ে দেয়।

বাবা—, যাব। বাবা, উ-যাব।

পৃথন পিছুদিকে তাকাতেই দেখতে পায় নৌকাটাকে। কারুর নৌকা। দেখেই চিনতে পারে পৃথন। এই সেদিন মাছের তেল লাগিয়ে রং করেছে। দূর থেকেই চিৎকার করে কারু, নৌকোয় কে বটে? পৃথন নাকি?

বুক থেকে তিরুকে নামিয়ে রেখে পৃথন বলে, আমি পৃথন। কি ব্যাপার কারু? ফিরলে যে বড়?

খবর খুব খারাপ পৃথন ভাই। কাল নৌকা নিয়ে ফিরছি হঠাৎ বলব কি দুলে উঠল নৌকোটা। পিছু ফিরে দেখি পেল্লায় এক ঢেউ ছুটছে মাঝ সাগরের দিকে।

বটে!

হ্যাঁ গো পৃথনভাই। আর সেই ঢেউয়ের মাথায়—ঐ যে কি যেন বলে—হয়েছে, ফোয়ারা।

তাজ্জব ব্যাপার।

তাজ্জব বলে তাজ্জব। ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে যাই ব্যাপারটা। কি হতে কি হয় বলা যায় না। সাবধানে থেক' পৃথনভাই।

কারু থামতেই তিরুনাল বলে, বাবা, গ-প—

চুপ কর তিরু।

তিরু না? এই, এই দুষ্টু? কি বলছিস?

ও বলছে গল্প বল। ঐ যে তুমি ঢেউয়ের কথা বললে।

ওরে দুষ্টু। গল্প শুনবি? নাও হে পৃথন নাও। এগুলো তিরুকে খেতে দিলাম।

কারু গুচ্ছের পমপ্লেট মাছ ঢেলে দেয় পৃথনের নৌকায়।

বরাতটা দেখছি ভালই।

তা যা বলেছ পৃথনভাই। আজ আসবার সময় বাবা শান্তার নাম করে বেরিয়েছিলাম।

বাবা—,খা-ব—

কি খাবি তিরু?

শা—তা—

এরপর কারু আর পৃথন দুজনেই হেসে ওঠে। তিরু হা করে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হাসির কারণটা কি। হাসি থামিয়ে পৃথন বলে, শান্তা খাব বলতে নেই, তিরু। ঠাকুর। পাপ হবে।

ছেলেটাকে কদিন না আনলেই পার পুথনভাই।

আরে না, না। ভয়ের কিছু নেই। ভয় খেলে কি পেট চলে কারু। আর তিরুটাকে বাড়ীতে রেখে আসতে ভয় করে। লীলামনির আর বয়েস কত। ও একা কতদিক সামলাবে।

কি জানি ভাই আমার কিন্তু মনটা 'কু' গাইছে। এতদিন সাগরে নেমেছি, মাছ ধরেছি, কিন্তু এরকমটা কোনদিন চোখে পড়েনি। মনে হয় অপদেবতা।

সাগর আমাদের দেবতা গো। ভাত, কাপড় যোগাচ্ছে। সাগরই দেখবে তার সন্তানদের।

কারু দুহাত কপালে ঠেকায়। তারপর বলে, এই ছেলেটা, এই তিরু এই নে, এই নে, দুটো দোশা। দাও হে পুথন, ছেলেটাকে দাও। আহা মা নেই।

থাক না কারুর। তুমি আবার—

না, না পুথন। মনটা আমার দিতে চাইছে। ওকে দাও দোশা দুখান। ও খেলেই আমার খাওয়া হবে। ছেলেটাকে দেখলে বড় মায়া লাগে হে। আচ্ছা আজ তাহলে যাই। তবে একটু সকাল সকাল ফেরাই ভাল। বলা যায় না হে কি হতে কি হয়।

কারুর ছপ, ছপ করে দাঁড় বাইতে বাইতে ফিরে যায়। একটু দূরে গিয়ে গলা ছেড়ে একটা ভাটিয়ালী ধরে।

> ও সাগর রে—,
> আরবসাগরের জল রে,
> অন্নমুখে তুলে দিলি,
> পরণে কাপড় রে।

বাবা—, যাব।

কোথায় যাবি তিরু ?

মা যাব।

পুথনের মনটা খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ। ছেলেটার জন্যে মনটা হু হু করে জলতে থাকে। মা-মরা ছেলে তিরু। মা যে কি জিনিস ভাল করে বুঝতে পারার আগেই মা মরে গেল। মেয়েটার জন্যেও পুথনের মনটা কি রকম করে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিরুকে আর একবার বুকে চেপে ধরে পুথন।

॥ ৩ ॥

একমনে নৌকার গায়ে রং লাগাচ্ছে লীলামনি। মাঝে মাঝে সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখে চেনা কারও নৌকো ফিরছে কিনা। ছোট্ট তিরুর জন্যে লীলামণির খুব মন কেমন করে। ভাবে, যদি নৌকো ডুবে যায় তাহলে কি হবে? ভয়ে পড়ায় মন দিতে পারে না লীলামণি। বাড়ীতেও থাকতে ভাল লাগে না। তাই সাগরের তীরে এসে নৌকোয় রং লাগায়, আর কেউ ফিরে এলে সাগ্রহে পৃথন আর তিরুর খবর নেয়। সাগরের জলকে লীলামণি মোটেই বিশ্বাস করে না। ওর বুকের দিকে চাইলেই লীলামণির বুকটাও দুর দুর করে। জল আর জল। সর্বদাই ফুঁসছে কেউটে সাপের মতো। ভাবে, ওটা একটা রাক্ষসী। সকলকে গেলবার জন্যে ছুটে আসছে।

লী-লা-ম-ণি —

চমকে ওঠে লীলামণি, তারপর সুপুরি ডাঁটার তুলিটা ফেলে রেখে ছুটে যায় সাগরের দিকে। দূর থেকেই চিৎকার করে, তি—রু—

কলকল, ছলছল করে সাগরের ঢেউ এসে ভেঙে পড়েছে বালির ওপর। আবার ফিরে যাচ্ছে। তারপর দ্বিগুন শব্দ করে আরও তীব্রগতিতে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে। জল মাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ পেরিয়ে লীলামণি বাবার নৌকোর দিকে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তিরুকে ডাকে চিৎকার করে।

আনন্দের আতিশয্যে ভয় ডর ত্যাগ-করে ঢেউ এর পর ঢেউ ডিঙিয়ে এগিয়ে যায় লীলামণি। হঠাৎ একটা ফিরতি স্রোতের টানে ডুব জল গিয়ে পড়ে। স্রোতটা তাকে নিয়ে যায় দূরে। অতিকষ্টে লীলামণি একবার চিৎকার করে বা—বা—

প্রথমে পৃথন তত গুরুত্ব দেয় নি। ওরকম তো প্রায়ই ঘটে। লীলামণি ডুবে যায় নি কখনও। লীলামণির চিৎকার শুনেই জোরে জোরে দাঁড় টানে পৃথন। আর একটু হলেই কি যে হত বলা যায় না। কিন্তু ঠিক সময়েই পৃথন এসে ওকে জল থেকে তোলে। তারপর সুরু হল বকুনি।

তোকে না বার বার বলেছি বেশী জলে নামবি না। তুই বড় অবাধ্য লীলামণি। কথা শুনিস না মোটেই।

মা-ময়া ছেলেমেয়ে। পৃথন ওদের বকে না বা মারধোর করে না। বকতে পৃথনের বড় মায়া লাগে। আজ বকাবকি করতেই লীলামণির চোখ বেয়ে জল পড়ে। মেয়ের চোখে জল দেখে পৃথনের মনটা আবার খারাপ হয়ে যায়।

কাঁদিস নে লীলামণি। এই দেখ কত পমপ্লেট্। কারু কাকা দিয়েছে।

লীলামণি চুপ করেছিল এতক্ষণ, শুধু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাবার কথায় গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

'উঁ উঁ' করে কাঁদতে কাঁদতে সারা রাস্তা চলে লীলামণি। বাড়ীতে ঢুকেও কান্না থামে না।

'হাত পা ধুয়ে' তিরুকে নিয়ে দাওয়ার ওপরই বসে পৃথন। লীলামণির কান্না তখনও থামে নি। কাঁদতে কাঁদতেই একটা থালা করে কিছু ইডলী আর বড়া এনে নামিয়ে রাখে বাবার সামনে।

কাঁদিস নে, লীলামণি। তোকে কিছু বলব না। কোনোদিন বকব না। কাঁদিস নে মা।

চোখের জল মুছে দাওয়ার একপাশে চুপ করে বসে থাকে লীলামণি।

পৃথন লীলামণিকে ডাকে, কাছে আয়, আমার কাছে আয়, আমার কাছে এসে বস মা।

চুপ করে বসে থাকে লীলামণি।

আয়, কাছে আয়। একটা কথা বলব।

লীলামণি সরে আসে বাবার কাছে। শোন। দুদিন পরেই বিষু পরব। তোকে আর তিরুকে নিয়ে কুইলন বেড়াতে যাব কেমন।

চুপ করে থাকে লীলামণি।

আর ওখান থেকেই তোর আর তিরুর জন্যে পরবের নতুন জামা-কাপড় কিনে দোব। তোর যা পছন্দ তাই কিনবি।

এবারে হাসি ফুটে ওঠে লীলামণির মুখে। ঠিক যাবে তো?

ঠিক যাব।

তুমি কতবার বলছে কুইলনে নিয়ে যাবে। কোনো দিন যাওনি।

এবারে যাবই, দেখিস।

আমাকে একটা মুখোশ কিনে দেবে, বাবা?

দোব।

তিরুকেও দেবে?

ঠিক আছে। কার মুখোশ নিবিরে?

সিংহ আর হাতির। জান বাবা পরবের দিন আমাদের ইস্কুলে হিরণ্যকশিপু বধ নাটক হবে। আমি সিংহের মুখোশ পরে। নৃসিংহ সাজব। কেমন হবে বাবা?

ভাল হবে। ঠিক আছে তোকে সিংহর মুখোশই কিনে দোব। পটকা কিনে দেবে। একবারে দশটাকার। আমি পোড়াব, আর তিক্ত দেখবে। তিক্ত—, এই তিক্ত—। দাওয়ার ওপরই ঘুমিয়ে পড়লি। ওকে ঘরে শুইয়ে আসি। তুমি কিন্তু আজ আর কোথাও যাবে না। আমার একা একা খুব ভয় করে।

কেন ভয় করে কেন?

মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়ির চারপাশে কেউ যেন ঘোরাফেরা করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় পা দিয়েছি এমন সময় মনে হল—

কি মনে হল?

লীলামণি একবার চারপাশ ভাল করে দেখে বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, মনে হল কাকার মতো কে যেন আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পুথন একমুহূর্ত কি যেন ভাবে। চিন্তায় কুঁচকে ওঠে কপালটা। তারপর বলে, একবার ফকির সাহেবের কাছে যাব। কারুর বলছিল সাগরে নাকি অপদেবতা দেখা গেছে। একটু তেলপোড়া নোব। যাব আর আসব।

উঠে পড়ে পুথন। ফকির সাহেবের কাছে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বাড়ী থেকে বের হবে এমন সময় লীলামণি ছুটে এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, আমায় একটা রঙীন শাড়ী কিনে দেবে, বাবা?

লীলামণির মাথায় একবার চুমু খায় পুথন। মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দোব।

॥ ৪ ॥

ফকির সাহেবের কাছ থেকে তেলপড়া নিয়ে ফেরার পথে কারুরের সঙ্গে দেখা হল পুথনের।

অমঙ্গল। মহা অমঙ্গল পৃথন। পুরুত ঠাকুর বলছে রাজা মহাবলী জপ ছেড়ে পাতাল ফুঁড়ে উঠেছেন।

এই অসময়ে? শুনেছি ওনম উৎসবের দিনই তিনি উঠে আসেন।

তাইতো বলছি পৃথন ভাই অমঙ্গল। খুব সাবধান। তিরুকে কদিন সাগরে নিয়ে যেও না ভাই।

বড় অশান্তি হয় কারুর। কুঞ্চনের সঙ্গে ছেলেটা প্রায়ই মারামারি করে। উন্নিটা রাগী। কুঞ্চনের মা'র কথায় ওঠে বসে। বড় অশান্তি বাধায় উন্নী। ঝগড়া করে।

তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও পৃথন ভাই। মনে হল—

কি মনে হল কারুর?

মনে হল তোমাদের বাড়ীতে বেশ চেঁচামেচি হচ্ছে।

পৃথন আর দাঁড়ায় না। হন হন করে এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই পৃথনের চোখ পড়ে লীলামনির ওপর। দাওয়ার ওপর বসে বসে কাঁদছে। উঠোনের চারধারে ইডলী, অপ্পম আর বড়া ছড়ান। তিরু সিঁড়ির ওপর বসে বসে চার পাঁচটা ইডলী একসংগে ধরে চিবুচ্ছে। বাবাকে দেখেই লীলামণি গলা ছেড়ে কাঁদতে সুরু করে।

পৃথন বুঝতে পারে সব। তবু লীলামণিকে শুধোয়, কি হয়েছে রে লীলামণি?

কাঁদতে কাঁদতে লীলামণি বলে, কাকী আমায় চোর বলেছে।

চোর বলেছে? কেন?

কুঞ্চণ বড়া খাব বলে কাঁদছিল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দুখানা বড়া দেবার জন্যে ওধারে গিয়েছিলাম। কাকী দেখতে পেয়ে বলল, আমি ওদের ইডলী আর বড়া চুরি করেছি। এরপর আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলো। কাকা এসে আমাদের খাবারগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পৃথনের মাথায় রাগ চড়ে যায়। উঠোনের একধারে সরু সরু কিছু চেলা কাঠ ছিল। তারই একটা তুলে নিয়ে এগিয়ে এল লীলামণির কাছে।

তুই ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলিস কেন?

কুঞ্চনের জন্যে মনটা খারাপ ঠেকছিল।

তোকে না হাজারবার বলেছি ওধারে যাবি না। ঝগড়াটে মেয়ে কোথাকার।

এরপর লীলামণিকে বেশ ক'ঘা দেয়   মার খেয়ে লীলামণি নেতিয়ে পড়ে দাওয়ার ওপর।

॥ ৫ ॥

দাঁড় টানছে পুথন। চারদিকে বেশ অন্ধকার। রাত থাকতেই জেলেরা সাগরে নৌকো ভাসায়। তা নইলে ফিরতে বেলা হয়ে যায়? বাজারও পাওয়া যায় না। মাছ সব পচে নষ্ট হয়ে যায়। তাই গোন্দাকে নিয়ে পুথনও বেরিয়েছিল। আসবার সময় লীলামনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল পুথন। ছলছল করছিল ওর চোখদুটো। অত মার খেয়েও মেয়েটা রাত থাকতে উঠে বাবার জন্যে ইড্‌লী বানিয়েছে। বুকটা টনটন করে পুথনের। উল্লিদের ওপর রাগ করে শুধু শুধু মেয়েটাকে ঠেঙিয়েছে পুথন। দুচোখে জল আসে পুথনের। বার বার পুথন নিজের হাত দুটো কাঠের ওপর ঠোকে।

তিরুনালকে পুথন আজ নিয়ে আসেনি। কারুর ভয় খাইয়ে দিয়েছে। মনে মনে ভাবে পুথন, বাড়ী বেচে গ্রামের অন্য কোথাও বাড়ি করবে। তাহলে অশান্তিটাকে এড়ানো যাবে। লীলামনির কথা ভাবতে ভাবতে দাঁড় টানছিল পুথন। হঠাৎ গোন্দার চিৎকারে চমকে ওঠে সে। গোন্দা-পুথনের কাছে কাজ করে।

মেঘ। মেঘ উঠেছে পুথন ভাই।

পুথন দেখে একটা কালো মেঘ সাগর থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মারছে। দেখতে দেখতে মেঘটার আকৃতি পালটে গেল। ছোট থেকে বড় হতে লাগল আধঘণ্টার মধ্যে ছেয়ে ফেললো আকাশটা। একটু পরেই হল ঝড়। নাচছে পুথনের নৌকোটা। মোচার খোলার মতো সাগরের জলে নৌকোগুলো উঠছে আর নামছে।

নৌকো ফেরা গোন্দা। বাগিয়ে ধর। মেঘটা হঠাৎ এসে গেল রে। বেশ হাওয়া বইছে।

দুজনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও টলমল করছে নৌকোটা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই বুঝি ডুবে গেল, ঢেউয়ের চাপে তলিয়ে গেল নীচে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সামলে নেয়। মনে মনে ভাবে পুথন তিরুকে আজ না এনে ভালই হয়েছে। তিরুর কথা ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পুথন। হঠাৎ গোন্দার চিৎকারে ও সতর্ক হয়ে ওঠে।

গেল, গেল, পুথন ভাই। শক্ত করে ধরো। ইস।

এখনি হয়েছিল আর কি।

শক্ত হাতে দাঁড় টানে পুথন। আকাশ আর সাগরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ওর বুক দুরদুর করে। কালো আকাশটার মতো কালো সাগরটাও ফুঁসছে।

ভূত, ভূ-উ-ত—

ঠক, ঠক করে কাঁপছে গোন্দা। অবাক হয়ে গেছে পুথনও। পরক্ষনেই শিউরে ওঠে গা। সাগরের বুকটা ভেদ করে প্রচণ্ডবেগে একটা ফোয়ারার জল ওপর দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। ফুলে উঠছে সাগরটা। তারপর সেই পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ের সামনে ওটা কি! একটা বীভৎস, কদাকার, ভয়ঙ্কর মুখ। মুখের ভেতর অংসখ্য ঝাঁঝরার মত হাড়। হাঁ করে ছুটে আসছে তাদের দিকে।

জোরে, আরও জোরে গোন্দা। তিমিঙ্গিল! তিমিঙ্গিল! নৌকো ফেরা-ও সব। তিমিঙ্গিল। জলের রাক্ষস।

প্রাণপণে দাঁড় টানে পুথন আর গোন্দা। সব মাঝিদের মুখেই আতঙ্কের ছাপ। ঝড় আর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে তীরের দিকে এগোচ্ছে পুথনের নৌকো। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে রাক্ষসটা ওদের দিকে।

॥ ৬ ॥

ব্যথায় টনটন করছিল লীলামণির গা, হাত, পা। তবু দুপুরের খাবার তৈরি করে রেখে তিরুনালকে নিয়ে সাগর পারে আসে। অনেক কাজ লীলামণির। তিরুনালকে বসিয়ে বলে, তিরু ঝিনুক নিয়ে খেলা কর। খবরদার, জলে যাবি না।

তিরু আপন মনে ঝিনুক নিয়ে খেলা করে। লীলামণি নৌকোর গায়ে রং লাগায়।

রং মাখায় আর ভাবে, কিছুতেই বাবার সঙ্গে কথা কইবে না, কুইলন ও যাবে না। পটকা নেবে না। মুখোশ নেবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবে শাড়ী। কিছু নেবে না সে। কিছু চায় না আর। তার কেউ নেই। কেউ তাকে ভালবাসে না।

মায়ের কথা মনে পড়ে লীলামণির। কি ভালই না বাসত। লীলামণিকে কুটো ভেঙে দুটো করতে হত না। কত কথাই মনে পড়ে লীলামণির। ওর মা ওকে মাঝে মাঝে ধানের তুঁষ নরম খোলায় পুড়িয়ে দিত। ও সেগুলো গুঁড়ো করে কালো রং করত। নিজে নিজেই চুন আর হলুদ মিশিয়ে লাল রং করত। সবুজ রং তৈরি করত গাছের পাতা শুকনো করে গুঁড়িয়ে। ঐ সব রং এর সঙ্গে মেশাত হলুদ আর আতপ চালের গুঁড়ো। এরপর মেঝের ওপর কালমেষণ্ডুর দেবীর ছবি আঁকত লীলামণি। ভাবতে ভাবতে দুচোখ দিয়ে জল উপছে পড়ে লীলামণির, ঠিক সাগরে জোয়ার এলে জল যেমন উপছে পড়ে তেমনি।

তিরুর কথা মনে পড়ে লীলামণির। মা'র কথা ভাবতে ভাবতে তিরুর কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হয় তার। পিছু ফিরে তাকায় লীলামণি। কিন্তু কই তিরু? এইখানেই খেলা করছিল একটু আগে, অথচ—

এদিক ওদিক তাকায় লীলামণি, কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না তিরুনালকে। চিৎকার করে ডাকে লীলামণি, তি—রু—না-ল—, তি—রু—

ভয়ে বুক দুর দুর করে লীলামণির। কালনাগিনীর মতো ফঁসছে সাগরের জল। জোয়ার এসেছে। এর ওপর আকাশে মেঘ আর মেঘ। পুরু আর কালো। ঝড়ও বইছে বেশ। 'কু' গায় লীলামণির মনটা, তিরুকে স্রোতে টেনে নেয় নি তো?

লীলামণির দুচোখ জলে ভরে যায়। সাগরটাকে মনে হয় যেন রাক্ষসী। গজরাতে গজরাতে ছুটে আসছে সকলকে খাবার জন্যে। তারপরই আছড়ে পড়ছে বালির ওপর। কাঁদতে ইচ্ছে করে লীলামণির। তিরুর কথা মনে হতেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। তি—রু—না—ল—, তি—রু—না—ল—

সাগরের গর্জনে চাপা পড়ে যায় তার গলায় স্বর। কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না।

॥ ৭ ॥

প্রাণপণে দাঁড় টানে পুথন আর গোন্দা। ছুটে আসছে রাক্ষসটা পিছু পিছু। বিশ্রী আর বীভৎস দাঁত। ঝড় আর ঢেউ এর-সঙ্গে যুদ্ধ করতে

করতে পুথনরা এগোচ্ছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। টনটন করছে হাতের সন্ধিগুলো। তবু ক্লান্তি নেই, নেই বিশ্রাম। একটানা প্রাণের দায়ে দাঁড় টেনে চলেছে দুজনে। থামলে আর রক্ষে নেই। রাক্ষসটা নৌকো সমেত দুজনকেই গিলে ফেলবে হয়তো।

দাঁড় টানতে টানতে ওরা যখন তীরের কাছে এসে পড়ে তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। পুথন টলতে টলতে উঠে আসে তীরের ওপর। তারপর শুয়ে পড়ে বালির ওপর। হাত, পা আর উঠছে না। গোন্দাও ক্লান্ত। সে মাছ সমেত জালটাকে নিয়ে এসে ফেলে বালির ওপর। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, চলে গেছে রাক্ষসটা।

মাছগুলো নিয়ে তুই-বাজারে যা, গোন্দা। আমি আজই একবার কোট্টায়ম যাব। শুনেছি ওখানে একজন বড় ফকির আছে। সে তুকতাক জানে। ওখানেই যাব একবার। শয়তানটা এরকম জালালে সকলকে উপোস করতে হবে। সাগরে আর মাছ ধরতে হবে না।

পু—থ—ন—, পু—থ—ন ভাই—

কারুর ? কি বলছ—

বলি হল কি, বালির ওপরেই শুয়ে পড়লে যে!

রাক্ষস। সাগরে রাক্ষস কারুর। তাড়া করেছিল। কি সর্বনাশ! ঢেউ দেখতে পেয়েছ ?

হ্যাঁ। আর ফোয়ারা। ওটা তিমিঙ্গিল কারুর। আমি শুনেছি ওরা নাকি তিমিকেও গিলে খায়।

আচ্ছা। তুমি দেখলে নাকি, ভাই ?

হ্যাঁ, নিজের চোখে। ঐ গোন্দাকে শুধোও। ইয়া বড় মুখ। দেহটা পেল্লায়। আর দাঁতগুলো—

বড় বড় চোখ করে কারুর পুথনের কথাগুলো গিলছিল। পুথন থামতেই বলে, দাঁতগুলো—

ঠিক যেন শয়তানের দাঁত। ঝাঁজরার মতো, আর অগুণতি।

তাহলে তো আর সাগরে নামা যায় না। একটা ব্যবস্থা কর, পুথন ভাই।

আমি এখনি কোট্টায়ম যাচ্ছি কারুর। ফকিরের কাছে। মেয়েটাকে খবরটা দিও। আমি সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব।

॥ ৮ ॥

তি—রু— না—ল—, তি—রু—

তিরুনালকে ডাকতে ডাকতে বালির ওপর ছুটোছুটি সুরু করে লীলামণি। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে ভিজে বালির চাদরের ওপর। একজোড়া ছোট্ট পায়ের ছাপ এগিয়ে গেছে সাগরের দিকে। কান্নায় ভেঙে পড়ে লীলামণি থর থর করে কাঁপে সারা গা।

সাগরের ঢেউগুলো এখন আর রাক্ষসীর মত চিৎকার করছে না, লীলামণির মতো কাঁদছে। হাহাকার করতে করতে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর।

পাগলের মত সাগরের তীর ধরে, জলের ওপর দিয়ে, ঢেউ মাড়িয়ে ছুটে বেড়ায় লীলামণি আর চিৎকার করে ডাকে, তি—রু—।

মাঝে মাঝে অভিশাপ দেয় সাগরকে। কখনও ঠাকুরের উদ্দেশে বলে, হে বাবা পদ্মনাভ। তিরুকে ফিরিয়ে দাও। আমি তোমায় পুজো দোব।

তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় লীলামণি, কিন্তু কোথায় তিরু? মাঝে মাঝে সাগরের ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ে যায়। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তিরুকে না পেলে ওর মরতেও দ্বিধা নেই। বেশ খানিকটা দূরে এসে দাঁড়ায় লীলামণি। এক সেকেণ্ডও বিশ্রাম না নিলে আর ছুটতে পারছে না। হঠাৎ একজায়গায় ওর দৃষ্টিটা আটকে যায়। কাছিমের গলার মত সাগরের স্রোত উঠে আসছে ওপরের দিকে, আবার নেমে যাচ্ছে। তারই একজায়গায় হাঁটুভর জলের ওপর ঢেউ ধরবে বলে তিরু দুহাত বাড়িয়ে আছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যায় লীলামণি। তারপর জাপটে ধরে টেনে আনে তিরুকে। ভাল করে দেখে সত্যিই তিরু কিনা। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, তিরু, তিরু আমার সোনার ভাই আমার।

আনন্দের আতিশয্যটা একটু কমে আসতেই লীলামণি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তিরুকে। ভিজে সপসপ করাছ দেহটা। সারা গায়ে বালি। মাথার চুল পর্যন্ত বালিতে ভরে গেছে। তিরুকে শুধোয়, কোথায় ছিলি তিরু?

তিরু হাসতে হাসতে দুহাত বাড়িয়ে বলে, যা—ব।

কোথায় যাবি?

ঢেউগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,উ—যাব।

লীলামণির বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। জলকে ভয় খাওয়া দূরে থাক্ কি করে ঢেউয়ের মধ্যে ও এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা ভেবে লীলামণির বোধশক্তি লোপ পাবার মতো হয়। ঠাস করে তিরুর গালে একটা চড় লাগায় লীলামণি, আর যাবি ওখানে?

ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে তিরুনাল। লীলামণি হঠাৎ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে, তারপর ছুটতে আরম্ভ করে বালির ওপর দিয়ে, বাড়ির দিকে।

॥ ৯ ॥

উন্নি আর পুন্নণের মধ্যে চলছে জোর শলা পরামর্শ। উন্নির এখন চরম দুর্দশা। অথচ পুথনের অবস্থা দিন দিন ভালই হচ্ছে। বেশ বড়লোক হয়ে উঠছে পুথন। ঈর্ষায় পুড়ছে দুজনায়। গোপ্পার মুখ থেকে উন্নি খবর পেল পুথন কোট্টায়ম যাবে। ফিরতে দেরী হবে। উন্নি জানে পুথনের ঘরে কাঁচা টাকা থাকে। ওর এখন বেশ কিছু টাকা চাই। সুতরাং এই সুযোগ। রাত আটটার আগে পুথন নিশ্চয়ই কোট্টায়ম থেকে ফিরতে পারবে না। তার আগেই টাকাগুলোকে হাতাতে হবে। সমস্যা ঐ মেয়ে আর ছেলেটাকে নিয়ে। পুন্নন হেসে গড়াগড়ি যায়।

এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি উন্নতি করবে?

বুঝতে পারছ না পুন্নন, মেয়েটা খুব চালাক।

শোনো, আজ সন্ধ্যেবেলা কুণ্ডুগানের আসর বসবে। লীলামণি তিরুনালকে নিয়ে যাবেই।

উন্নির চোখ দুটো চকচক করে।

ঠিক, ঠিক বলেছ, পুন্নন। সেই সুযোগে তালা ভেঙে ঢুকতে হবে। কিন্তু যদি না যায়?

তাহলে তো আরও ভাল। ওদের দুজনাকেই ঘরে পুরে আগুন লাগিয়ে দেবে ঘরে। লোকে ভাববে রান্না করতে গিয়ে ঘরে আগুন লেগে ওরা পুড়ে মরেছে।

তারপর?

তারপর আবার কি টাকাগুলো চুরি করবে। এরপর তোমার ঐ বৈমাত্রেয় ভাই পুথন। ওকে সরাতে পারলেই সব কিছু একদিন আমাদের হাতে আসবে।

ঠিক, ঠিক বলেছ প্রসন্ন। তোমার বুদ্ধি আছে। ওদের সরাতেই হবে, যে করেই হোক। তাহলে রাজার হালে থাকা যাবে।

বাড়ীর কাছেই কুণ্ডুগানের আসর বসবে। লীলামণি সকাল করে রান্না-বান্না সেরে বাবার জন্যে অপেক্ষা করে। সন্ধ্যে হয়ে এল অথচ পুথনের দেখা নেই। ওদিকে কুণ্ডুগানের রামায়ন গানের মত আসর বসে গেছে। লীলামণির দেরী সয় না। ঘরে তালা দিয়ে তিরুকে নিয়ে ছোটে।

একটু দেরী হয়ে গেছে লীলামণির। মূল গায়েন পেটা ঘড়িতে ঘা দিয়েছে অনেক আগেই। গান সুরু করে দিয়েছে দোয়ারের সঙ্গে। করতাল, ঢাক আর মৃদঙ্গের শব্দে আসর জমজমাট। নটনটীরা নাচতে সুরু করেছে। তন্ময় হয়ে গান শোনে লীলামণি। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হয়, বাবা ফিরতে পারে। মনে মনে ভাবে লীলামণি একবার ছুটে বাড়ী গিয়ে দেখে আসবে বাবা ফিরেছে কিনা। ফিরলে চাবিটা দিয়েই চট্ করে ফিরে আসবে' না ফিরলে তো কথাই নেই। তিরুনাল অবাক হয়ে আসরের দিকে তাকিয়ে আছে। ঢাক ঢোলের আওয়াজ শুনে ও খুব খুশী। তিরুনালকে রেখে লীলামণি ছুট দেয় বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে ঢুকে লীলামনি দেখে বাবা তখনও ফেরেনি। ঘরে তালা দেওয়াই আছে। সব ঠিকঠাক আছে দেখে ফিরছিল লীলামণি হঠাৎ ওর মনে হল তাড়াতাড়িতে রান্নাঘরের ওদিককার জানলাটা বন্ধ করা হয় নি। বেড়াল ঢুকে হয়তো সব শেষ করে দিয়েছে। কিছু খাবার নেই। তালা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে লীলামণি। ভাল করে দেখে নেয় ঘরের ভেতরটা। খাবার দাবার যেমনটি রেখে গেছে ঠিক সেইরকম আছে। জানলাটা বন্ধ করে ঘরের বাইরে আসতে গিয়েই অবাক হয়ে যায় লীলামণি। ওর কাকা উন্নি ঘরের কপাটটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকে না লীলামণির। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব আছে। জানলা খুলে চিৎকার করে লোক ডাকে লীলামণি। কিন্তু ঢাক, করতাল আর মৃদঙ্গের আর্তনাদে লীলামণির ভয়ার্ত কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়।

তিরুণাল অবাক হয়ে নাচ দেখছে। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছে খুশিতে। এক সময় বলে, দিদি, উ-যাব। দিদি—, উ—যাব।

দিদির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে তিরুণাল ঘাড় ফেরায়। দেখে

দিদি নেই। প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে বাইরে এক পা এক পা করে।

বাইরে বেশ অন্ধকার। ভয় পায় তিরুনাল। বার বার 'দিদি দিদি' বলে ডাকে, কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে আরও জোরে কান্না সুরু করে।

তিরু, এই তিরু—, এদিকে আয়।

তিরু দেখে সামনেই সব কাকা।

কাকা—, দিদি যাব।

দিদির কাছে যাবি ? আয়, সেখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তিরুনালকে টেনে নিয়ে যায় উন্নি। একবার ভয় পেয়ে তিরু বলে, কাকা-দিদি-যাব।

গর্জে ওঠে উন্নি, চুপ কর ছোঁড়া। বলছি তো সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে তিরুনাল। কাকা উন্নিকে ও যমের মতো ভয় পায়। আর একটু এগিয়েই হঠাৎ তিরুনালের মুখটা চেপে ধরে উন্নি। সেখানে দাঁড়িয়েছিল পুন্নন। হাতে একটা বড় থলে আর কিছুটা ছেঁড়া কাপড়। দুজনে তাড়াতাড়ি বেঁধেফেলে তিরুর মুখটা তারপর থলের মধ্যে তিরুনালকে পুরে উন্নি হনহন করে এগোয় সাগরের দিকে।

অন্ধকার পথ ধরে ফিরছিল পুথন। বেশ দেরী হয়ে গেছে ওর। শাড়ী আর মুখোশ কিনতে গিয়েই দেরী হয়ে গেল। মা মরা মেয়ে। স্নেহ ভালবাসা পায়নি বলতে গেলে। দিনরাত কেবল খাটুনি। তাই লীলামণির জন্যে একটা দামী শাড়ীই কিনেছে পুথন। সারাটা রাস্তা পুথন লীলামণির কথা ভাবতে ভাবতেই আসছে। প্রথমে হয়তো মেয়েটা ওর সঙ্গে কথাই কইবে না। পুথন শাড়ীটা বের করবে। সঙ্গে সঙ্গে একমুখ হাসি ফুটে উঠবে লীলামনির, মুখে। ভাবতে বেশ আনন্দ লাগে পুথনের। আপন মনেই হাসে পুথন। তার হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই ওদের বাড়ির দিক থেকে অনেক লোকজনের চিৎকার ভেসে আসে, আ—গু—ন। আ—গু—ন।

তাড়াতাড়ি পা চালায় পুথন। ছেলেমেয়ে দুটো একলা আছে। বুকটা দুরদুর করে পুথনের! যেন একটা মহাবিপদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। এই সময় ওর মনে হল উন্নির মত কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে।

পুথন বলে, কে ?

এঁ্যা! এই আ—আ-মি।

উন্নি ?

হ্যাঁ।

পৃথনের কথা কওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বার বার একটা অমঙ্গলের ছায়া মনের মধ্যে উঁকি মারছে ওর। তাই শুধোয়, ওদিকে কিছু হয়েছে না কি ? ও কিসের চিৎকার ?

চিৎকার ! কি জানি।

বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল উন্নি। পৃথনের চোখ দুটো ওর পিঠের দিকে যায়। পিঠের ওপরের থলেটা নড়ছে যেন বেশ। কেউ যেন হাত, পা ছুড়ছে। অবাক হয়ে পৃথন শুধোয়, থলের মধ্যে কি আছে রে, উন্নি ?

উন্নি দু, একবার আমতা আমতা করে, কি বলবে ভেবে পায় না। তারপর বলে, একটা বেড়াল। কদিন ধরেই বড্ড জ্বালাতন করছে। সাগরে ফেলে দেব।

উন্নির চোখদুটো জ্বলে ওঠে একবার, তারপর সে আর কথা না বলে হণ হণ করে এগিয়ে যায় সাগরের দিকে। পৃথনও আর দাঁড়ায় না। বাড়ীর দিকে এগোয়।

দূর থেকেই পৃথন বুঝতে পারে তার রান্নাঘরে আগুন লেগেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে পৃথন। যাকে দেখে তাকেই শুধোয় আমার লীলামণির কিছু হয় নি তো ? আমার তিরু বেঁচে আছে তো ?

কেউ কিছুই বলে না। বাড়িতে পা দিয়েই গতিশক্তি হারিয়ে ফেলে পৃথন। লোক গিজগিজ করছে। উঠোনে একটা মাদুরের ওপর কে যেন শুয়ে ! ছুটে যায় পৃথন। লীলামণি। তার লীলামণি ! পুড়ে ঝলসে গেছে সারা দেহ। চিনতেই পারা যায় না। নিস্প্রাণ। নির্বাক।

লী—লা—ম—ণি—

চিৎকার করে ওঠে পৃথন, তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় লীলামণির পাশে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় নতুন কেনা শাড়ী আর মুখোশটা।

জ্ঞান ফেরার পর পৃথন ক্ষীণ স্বরে বলে, তিরু, আমার তিরু কোথায় ?

তিরুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পৃথন ভাই। কারু। এ কী হল কারু ?

কারুর দুচোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

লীলামণি যে নেই একথা ভাবতেই যেন কিরকম লাগে পৃথনের। এই

সাগরে যাবার আগে যাকে দেখে গিয়েছিল এখন আর সে নেই। বিহ্বলতাটা একটু একটু করে কাটতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় পৃথন, তারপর পাগলের মতো ছুটতে থাকে সাগরের দিকে।

আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি মারছে। ফিকে হয়ে আসছে আন্ধকারটা। নৌকোর ওপর তিরুনালকে চাপিয়ে সেটাকে বেশ খানিকটা ঠেলে নামিয়ে দিয়ে জল থেকে উঠে আসে উন্নি। নৌকোটা এগোচ্ছে একটু একটু করে গভীর সাগরের দিকে। ধীরে স্থস্থে ফেরে উন্নি। মাঝপথে দেখা হয় পৃথনের সঙ্গে। তাকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়ায় পৃথন, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তিরু কোথায় ?

তিরু ? কি জানি ? আমি কি করে জানব ?

তুই সব জানিস শয়তান। ভাই হয়ে ভাইয়ের এত বড় সর্বনাশ করলি, উন্নি ? বল তিরু কোথায় ?

বলছি তো আমি জানি না।

বাঘের মতো পৃথন ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্নির ওপর।

তোকে আমি খুণ করব শয়তান। তুই আমার লীলামনিকে পুড়িয়ে মেরেছিস।

ছাড়, ছাড বলছি।

তোকে খুন করব শয়তান। বল, বল আমার তিরু কোথায় ?

প্রথমে উন্নি-বে-কায়দায় পড়ে হাত, পা ছুঁড়ছিল। কিন্তু পৃথনের চেয়ে ওর স্বাস্থ্যটা ভালই। শক্তিও বেশী। একটু পরেই পৃথনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে উন্নি। পৃথন আবার তেড়ে যায়। এরপর স্থরু হয় মারামারি। প্রথমে উন্নি মার খায়, তারপর মারতে স্থরু করে। ঈর্ষায় জ্বলছে উন্নি। প্রতিহিংসায় কাঁপছে পৃথন। বেশ কিছুক্ষণ ঝটাপটি চলে। কেউই কাউকে কাবু করতে পারছে না। পৃথনের মার খেয়ে একসময় ছিটকে পড়ে উন্নি। ছুটে যায় পৃথন ওর বুকের ওপর বসতে, কিন্তু তার আগেই উঠে পড়ে উন্নি। হাতের কাছেই পড়েছিল একটা ভাঙা বৈঠা। সেটা কুড়িয়ে নেয় উন্নি, তারপর এগিয়ে যায় পৃথনের দিকে।

যা হতভাগা তোর তিরুর কাছে।

এরপর এলোপাতাড়ি পিটতে থাকে পৃথনকে। পিটতে পিটতে গর্জন করে উন্নি, যা শয়তান তোর তিরুর কাছে। সে এতক্ষণ মাঝ সাগরে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

বার বার উঠতে চেষ্টা করে পৃথন, কিন্তু প্রতিবারই বৈঠার আঘাতে পড়ে যায় আবার। মার খেতে খেতে পৃথন যখন আধমরা তখন বিকট শব্দ করে হেসে ওঠে উন্নি। তার সেই বীভৎস মুখটা পৃথনের চোখের সামনে একবার ভেসে ওঠে, তারপরই অন্ধকার নেমে আসে চোখে। আবার জ্ঞান হারায় পৃথন। মনে মনে ভাবে উন্নি, এবারে শাস্তি। ছেলেমেয়ের শোকে বাপটা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে অথবা আত্মহত্যা করবে। তারপর দুহাতে মজা লুটবে সে। অন্ধকারে মিলিয়ে যায় উন্নি।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে পৃথনের। গা, হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। একবার উঠতে যায় পৃথন, কিন্তু পারে না। চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ তিরুর মুখটা ভেসে উঠতেই জোর করে উঠে দাঁড়ায় পৃথন। এখনও সময় আছে। তিরুকে হয়তো ফিরে পাওয়া যেতে পারে। টলতে টলতে সাগরের দিকে এগিয়ে যায় পৃথন।

সাগরের হাহাকার পৃথনের কানে আসছে। বুকটা ভেঙে যাচ্ছে ওর। কোনরকম নিজের নৌকোটাকে সাগরের জলে ভাসায় পৃথন। অতিকষ্টে, নৌকোয় ওপর উঠেই শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ। মোচার খোলার মত টলমল করছে নৌকোটা। এখনি হয়তো তীরের ওপর আছড়ে পড়বে। সমস্ত শক্তির সাহায্যে উঠে বসে পৃথন, তায়পর হাল ধরে।

সাগর নয় যেন চড়াই আর উতরাইয়ে ভরা ভূমি। তারই ওপর দিয়ে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত পৃথন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটা। দাঁড় টানছে পৃথন আর চারধারে তাকিয়ে দেখছে। দ্বিতীয়ার চাঁদটা আকাশের হাত ছয়েক ওপরে। অন্ধকারটা কেটে গেছে অনেকটা। চিক চিক করছে ঢেউয়ের মাথাগুলো। অস্পষ্ট আলোয় সে দেখে দূরে ভাসছে একটা নৌকো।

চিৎকার করে ডাকে পৃথন, তি—রু—না—ল—, তি—রু— .

দূর থেকে একটা ছোট্ট ছেলের ভয়ার্ত ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসে, বা—বা—, যা—ব—

তি—রু—

বা—বা—, যা—ব—

পৃথনের বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করে। এই মুহূর্তেই সে যদি ছুটে যেতে পারত ছেলেটার কাছে। জোরে, আরও জোরে দাঁড় টানে পৃথন। কিন্তু

পেরে ওঠে না সে। একেই সে একা, তার ওপর ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে তিরুব নৌকোটা গভীর সাগরের দিকে।

চিৎকার করে পৃথন, তি—রু—, ভয় নেই, যাচ্ছি, আমি তোর কাছে যাচ্ছি বাবা।

দূর থেকে তিরুর গলা শোনা যায়, বা—বা—, বা—ব—।

হঠাৎ একটা পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ছুটে যায় তিরুর দিকে। চাঁদের আলোয় চিক চিক করে ফোয়ারার জল। তারপর পলকে প্রলয় ঘটে যায়। কোথায় নৌকো, কোথায় তিরু।

চিৎকার করে ওঠে পৃথন, তি—রু—, তি—রু—না—ল—

কান্নায় ভেঙে পড়ে পৃথন, আছাড়—পাছাড় করে নৌকোর ওপর।

আরব সাগরের ঢেউগুলো বিকট শব্দ করে হাসতে হাসতে আছড়ে পড়ছে তীরে। ঢেউগুলোর খলখল হাসি শুনে পৃথনের মনে হয় ঠিক যেন উন্নি হাসছে তার দিকে চেয়ে। হাসতে হাতে লুটিয়ে পড়ছে বালির ওপর।

॥ ১০ ॥

দিন যায়। মাস যায়। পৃথন আর ফেরে না। তার কোনো সন্ধানই মিলন না। লোকে ভাবল ছেলে মেয়ের শোকে পৃথন সাগরের জলে ডুবে মরেছে। উন্নি যে সবের মূল সেটা কেউ বুঝতে পারল না। সকলেই ভাবে তিরুনালও তার দিদির সঙ্গে পুড়ে মরেছে। তখন উন্নি পৃথনের সব কিছু হস্তগত করে ভোগদখল করতে লাগল। কিন্তু উন্নির ভাগ্য বুঝি খারাপ। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এক নতুন বিপদ এসে হাজির হল।

পোষ মাস। খেতে খামারে ধান আর ধান। মাঠের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। সোনার রাজত্ব। কোথাও পাকা ধানের গাদা, কোথাও আবার মাঠ ভরা ধানগাছগুলো সোনালা রংএর ধানের ভারে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরু হয়েছে তিরুবাতিরা উৎসব। আনন্দে মত্ত আলেপ্পি। উৎসবের শেষ দিন পুন্নন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে চান করতে নামে সাগরে। কেউ জল ছিটে চ্ছে, কেউ ঢেউ খাচ্ছে। আনন্দে মত্ত সবাই। হঠাৎ সকলের লক্ষ্য পড়ল কারু মাঝির নৌকোটা টলতে টলতে ছুটে আসছে তীরের দিকে।

নৌকো তীরে আসতেই নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে কারু জলের ওপা কাঁপতে কাঁপতে এসে আছড়ে পড়ে বালির ওপর।

ছেলেমেয়ে যে যেখানে ছিল ছুটে এল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে তা নইলে এই সকালে কারুর নৌকো নিয়ে ফিরেই বা আসবে কেন আর বালির ওপর পড়ে হাঁপাবেই বা কেন। হাজার লোকের হাজার প্রশ্ন। একটু সামলে নিয়ে কারু বলে, ভূত - !

সকলে সমস্বরে বলে, ভূত ? কোথায় ?

সাগরে। আমি নিজের চোখে দেখলাম।

আবার প্রশ্ন, কি দেখলে গো ? কি রকম দেখতে ?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কারু বলে, একটা পাহাড়ের মতো ঢেউ। আর তার মাথায় তিরুনাল।

তিরুনাল !

সকলের বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কারু বলে, হ্যাঁ ; পুথনের ছেলে তিরুনাল।

তারপর ?

অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি। হঠাৎ মিলিয়ে গেল সাগরে।

কথাটা শুনেই পুন্ননের তো ভিরমি যাবার যোগাড়। ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ীতে ঢোকে। তারপর হাঁপ ছাড়ে।

পুন্ননের মুখ থেকে উন্নি সব শুনল, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করল না। কিন্তু উন্নির বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এসে যায়। আলেপ্পির জেলেরা একে একে সকলেই প্রায় দৃশ্যটা দেখতে পায়। কেউ আবার এক বিকট, ভীষণ-দর্শন সামুদ্রিক জীবের ওপর দেখতে পেল তিরুনালকে। সকলেই বলল, ওটা তিমিঙ্গিল। জীবটা তিমি গিলে খায়। অনেকে তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে। কারও বা নৌকো উল্টে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ফলে জেলে-মাঝিদের মনে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। একদিন নৌকা নিয়ে বের হল গোন্দা, কিন্তু আর সে ফিরল না। এরকম পরপর তিনটে ঘটনা ঘটার পর মাঝিরা নৌকো নিয়ে সাগরে নামা বন্ধ করল।

ওঝা এল, পুরুত এল ; যাগ-যজ্ঞ হল ; পীরের কাছে সিন্নী মানত করা হল। কিন্তু অবস্থা যে কে সেই।

এদিকে উন্নীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মানসিক রোগে ভুগতে লাগল সে।

রাতের দিকে প্রায়ই সে লীলামণিকে দেখতে পায়। দেহটা পুড়ে, ঝলসে গেছে। এখানে ওখানে মাংসপিণ্ড জমে রয়েছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। মাঝে মাঝে পৃথনকেও দেখতে পেল। মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ। রুক্ষ একমাথা চুল। গায়ে একটা কালো কম্বল জড়িয়ে উঁচু হয়ে বসে রয়েছে দাওয়ার এক কোণে। কখনও দিবা স্বপ্ন দেখে। তিরুনাল ফিরে এসেছে। জমি, জায়গা সব কেড়ে নিয়েছে। সে পথে পথে পুন্নন আর কুঞ্চনের হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

এই দারুণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে উন্নি ঠিক করল এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। সে নিজেই মাঝিমাল্লা নিয়ে, তীর, ধনুক, বন্দুক বোঝাই করে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে সাগরের সর্বত্র।

কিন্তু ভাবলে হবে কি বাস্তবে ভাবনা অনুযায়ী কাজ করা যে কত শক্ত সেটা উন্নি বুঝতে পারল। মাঝিমাল্লারা সাগরে নামতে রাজী নয়। সাগরের নাম শুনেই শিউরে উঠল সকলের গা, হাত, পা। শেষে অনেক কষ্টে, বেশ টাকা পয়সা খরচ করে কিছু লোক যোগাড় করল। ক'খানা নৌকো করে তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম আর বন্দুক নিয়ে দুর্গা, বলে একদিন তারা বেরিয়ে পড়ল। উন্নি সকলকেই বলল, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একযোগে আক্রমণ করা হয়। যে করেই হোক দুটোকেই খতম করতে হবে।

উন্নি নিজের কাছেও রাখল একটা ভাড়া করা বন্দুক। টলতে টলতে, হেলতে দুলতে এগিয়ে চলল নৌকাগুলো।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত টহল দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরছিল তারা। উন্নি না ভাবছে তাড়া খেয়ে ভয় পেয়েছে জীবটা। ব্যূহ ভেঙে তীরের দিকে এগোচ্ছে নৌকোগুলো। হঠাৎ 'গেল গেল' চিৎকার। পেল্লায় একটা ঢেউ ছুটে আসছে তীরের বেগে। একটু একটু করে ভেসে উঠলো একটা জীবের পিঠের দিকটা। ওপরে বসে মানুষের মতো আর একটা জীব।

বন্দুক চালাও, বল্লম ছোঁড়।

গর্জে উঠলো উন্নি। কিন্তু বন্দুক চালাবে কে। সকলেই ভয়ে ভিরমি যাবার যোগাড়। কোনোরকমে গর্জে উঠলো উন্নির বন্দুকটা। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে প্রলয় ঘটে গেল। সেকেণ্ডের মধ্যে জীবটা ডুব দিল সাগরে, হতভম্ব সকলে। মাঝিমাল্লা সমেত একটা নৌকো শূন্যে উঠেই ছিটকে পড়ল দূরে। একসঙ্গে একটা চীৎকার উঠলো, তিমিঙ্গিল। বাঁচাও।

দেখতে দেখতে জলের নীচে তলিয়ে গেল পর পর দুটো নৌকো লোকজন সমেত। সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল সকলের মধ্যে। তীর, ধনুক ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই। উন্নির হাজার চিৎকার সত্ত্বেও নৌকো ছুটতে লাগল তীরের দিকে।

এদিকে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো খববটা। মাঝিদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ঘিরে ধরল উন্নিকে। ওরা মোটা টাকা দাবী করল ক্ষতিপূরণ হিসেবে। উন্নির সাফ জবাব, আমি কি জানি বাপু। ওরা গেল কেন? আমি ওদের পাওনা-গণ্ডা আগেই মিটিয়ে দিয়েছি। খামকা জ্বালিও না।

লোকগুলো ফিরল বটে, তবে বলতে বলতে গেল, সুযোগ পেলে দেখা যাবে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পুন্নন বলে, কিছু দিয়ে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যেত।

গর্জে ওঠে উন্নি, চুপ কর। তোমাকে এর মধ্যে মাথা গলাতে হবে না। এ সব আমার। একা আমার। একটা পয়সাও আমি কাউকে দোব না।

ওরা যদি রাতে ঘরে আগুন লাগায়?

বিকট শব্দ কবে হেসে উঠে উন্নি, তারপর আকাশের দিকে হাতের বন্দুকটা তুলে ওর ঘোড়ায় একবার চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে এক ঝলক আগুন ছুটে যায় শূন্যে। ভয় পায় পুন্নন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ক বছর। আবার সাগরে জেলেরা মাছ ধরতে নামে, ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটে। এই ঘটনার পর থেকে সাগরের ওপর আর কেউ সেই পাহাড় প্রমাণ ঢেউ দেখতে পেল না, দেখতে পেল না তিরুনালকেও। সকলে ভাবল, যাকে তিমিঙ্গিলের পিঠে দেখা যেত' সে কি সত্যিই জীবন্ত তিরুনাল না তার প্রেতাত্মা? উন্নির বন্দুকের গুলিতে কি তিরুনালের মৃত্যু হয়েছে?

ধীরে ধীরে সকলের মন থেকে তিরুনালের স্মৃতি মুছে গেল। শুধু একজন ভুলতে পারল না তাকে। উন্নি। শকুনীর মত ওর দৃষ্টিটা ঘুরে বেড়াতে লাগল সাগরের বুকে। কখন ভেসে উঠবে তিরুনাল এই আশায়। দেখা পেলেই সে তার ধারাল ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে তাকে।

॥ ১১ ॥

১৯৪৪ সালে। পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের দামামা-ধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছে। বিপদসঙ্কুল সাগরের বুকে ভেসে উঠলো বেনের জাহাজ। সাবমেরিন বা মোটর-টর্পেডোর আতঙ্ক নেই বললেই চলে। শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষের হাতে নাজেহাল। একটু একটু করে কমে আসছে প্দীপের শিখা।

গল। সোনার লঙ্কার শেষ সীমান্তের প্রহরী। এরপরই স্বরু হয়েছে সীমাহীন সাগরের।

গলের তাশিশ দুর্গ। বৌদ্ধ জনসমাজের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী সিরিয়ান-খ্রীষ্টানদের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে বেশ কিছু তামিলী জেলে। এরা সাগরে মাছ ধরে, আর তাই বেচে পেট চালায়।

গলের চারপাশে বন আর বন, সবুজ চোখ-জুড়োন বনে ঢাকা চারধার। বনের মধ্যে আছে নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি গাছ মাঝে মাঝে কলাগাছের সারও দেখা যাবে। আর আছে মৌরীবন। কোথাও বা অযত্নে বেড়ে উঠেছে এলাচ, লবঙ্গ আর দারচিনির গাছ। নারকেল গাছ নুয়ে পড়ছে ফলের ভারে। ফল নয় যেন সোনাব ডেলা। কাঁদির ভারে নুয়ে পড়েছে কলাগাছের মাথা। গাছে গাছে হলুদের সমারোহ। পাকা আম, পাকা কাঁটাল, পাকা কলা, সোনালী রংএর নারকোল। দেখলে চোখ আর মন দুইই জুড়িয়ে যায়। অবশ্য শুধু গল নয়, সিংহলই তাই। ১৪০ মাইল চওড়া আর ২৭০ মাইল লম্বা এই দেশটার সর্বত্রই চোখে পড়বে এক দৃশ্য। সেইজন্যই বুঝি এ দেশকে বলা হয় সোনার লঙ্কা।

ইসালা—পেরাহেরা অর্থাৎ ঝুলন পূর্ণিমা উৎসব। দেশের বৌদ্ধসমাজ মেতে উঠেছে আনন্দে। সর্বত্র এক সুর, এক রব—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

আনন্দে মেতে উঠেছে বনের পশু-পাখিরাও বুঝি। এখানে সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে সীংগল, রঙীন সারস; বনের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে সাদা হরিণ, হাতী, গল-ওয়াই আর লাহুগলা; বাঘের হুঙ্কারে পালাচ্ছে বায়সন, শম্বুর আর

াকার হরিণ। গাছের ডালে ডালে কিচির মিচির করছে বানরের দল, অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে ধনেশ পাখি আর কাঠ-ঠোকরারা ; রঙ্গীন ঘুঘুদের মিষ্টি ডাক শুনছে হরিয়াল, চক্রবাক, ওরিওর আর হর্ণবিল ; শূন্যে স্থির ডানা মেলে একদৃষ্টে শিকারের দিকে চোখ মেলে রয়েছে কয়েকটা নীলকণ্ঠ। মনের সুখে গাছের মাথায় গান ধরেছে কোকিল, আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে শিস দিচ্ছে বুলবুল।

আঁধার থাকতেই মাঝিরা নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে সাগরে। মাছ ধরার নাম করে এরা সাগরে বে-আইনী কাজ কারবারও চালায়। সোনার লঙ্কা। সাগরের নীচে যেমন আছে প্রবালের দ্বীপ, শামুক, হাঙ্গর, ঠিক তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে শুক্তি, যার মধ্যে আছে সাদা সাদা মুক্তো। আর আছে রং চঙে মাছ আর শামুক। সিংহলীরা একদিকে যেমন ডাঙার নারকেল গাছের কাঠি, পাতা, ছোবড়া, ছিবড়ে, খোলা, জল আর তেল বেচে টাকা রোজগার করে, অপরদিকে সাগরে ডুব দিয়ে তোলে দামী দামী সাদা মুক্তো, যা বেচে আয় করে প্রচুর টাকা।

তাঁশিশ দুর্গের অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে এইসব মাঝিরা শুক্তি তোলে, আর তা থেকে মুক্তো বের করে লুকিয়ে রাখে এক গোপন স্থানে। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সপ্তাহে বা মাসে ভারতমহাসাগরের ঢেউ ডিঙিয়ে এসে হাজির হয় একটা বিদেশী জাহাজ। তারপর টাকার বিনিময়ে নিয়ে যায় সঞ্চিত মুক্তো।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে ভাসছে চারটে নৌকা। তার ওপর কালো কালো ক'জন জেলে। পরণে সাদা লুঙ্গি আর হাফসার্ট। চারদিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে। কোমরে দড়ি বাঁধা। নৌকার ওপরে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন। একটু পরেই ঘন ঘন নড়ে ওঠে দড়িটা। বিপদের সঙ্কেত। সবাই মিলে টেনে তুললো লোকটাকে। সকলে সমস্বরে বলে, কি ব্যাপার পেরেরা! হল কি ?

পেররা বলে লোকটা নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

সকলে আবার বলে, কি হয়েছে রে ? কাঁপছিস কেন হাঁদারাম ?

পেরেরা বলে, আমি রহুনার বনে, হাতির সামনেও যেতে রাজী, তবু আর সাগরের তলায় নামছি না। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয় সব।

ব্যাপার কি পেরেরা! আসল কথাটা কি তাই বল ?

আশ্চর্য! অবাক কাণ্ড! অদ্ভুত! আড়াই হাজার বছরের মহাবংশের রাজাদের গল্পের চেয়েও অদ্ভুত।

মার্ভিন বলে আর একজন মাঝি গর্জে ওঠে, বেকুব কোথাকার। ওর স্বভাবটা ঠিক শামুকের মত। চট করে মুখ খুলবে না। বল উজবুক কি দেখেছিস?

তোরা তো জলে নামিয়ে দিলি। বেশ খানিকটা নেমে গেলাম। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা রাবণ-ছাড়া। চিংড়ি আর তারামাছ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। এরপর ঢুকে পড়লাম একটা বাগানে।

মার্ভিন বলে, বাগান!

হ্যাঁরে বাগানই। সবুজ শেওলার মধ্যে ফুটে আছে তারার মতো ফুল, কিছু চন্দ্রমল্লিকা, সরু পাপড়িওলা পদ্ম। তার মধ্যে আবার কত রং বেরংয়ের প্রজাপতি। দু'একটা অদ্ভুত মাছও রয়েছে। হরিণের মতো শিং।

মার্ভিন বলে, মুখ্যু কোথাকার! ওটা বাগান নয়। ওগুলো মাছ। স্পঞ্জ, সাগর-পদ্ম, সী-আরচিন এই রকমের। তুই আর নামিস কবে। তাই কিছুই জানিস না। আর ঐ যে প্রজাপতি বললি ওগুলো সত্যিকারের প্রজাপতি নয়। ওগুলোও মাছ।

মার্ভিন ওদের মধ্যে শিক্ষিত। ওরা তাই মার্ভিনের কথাকেই যথার্থ বলে মেনে নেয়।.

পেরেরা বলে, তাই হবে। তারপর শোন। দেখলাম শেওলার নীচে খোলসের মধ্যে একটা কাঁকড়া ঢুকে কী যেন খাচ্ছে।

মার্ভিন বলে, যোগী-কাঁকড়া।

একজন ধমকে ওঠে মার্ভিনকে, তুই থাম মার্ভিন। বাধা দিস না। বল পেরেরা তারপর কি হল?

আমি অবাক হয়ে দেখছি। হঠাৎ মনে হল এক ঝাঁক মাছ ছুটে চলে গেল সামনে দিয়ে। তারা মাছগুলোও হাঁচড় পাঁচড় করতে করতে ঢুকে পড়ল শেওলার জঙ্গলে। তারপরই একটা—

ভয়ে গলার স্বর বুজে আসে পেরেরার। সকলে বলে ওঠে, কি হল! একটা—?

একটা বীভৎস, প্রকাণ্ড মুখ। ঠিক যেন দৈত্য। হাঁ করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। দুটো চোখ যেন আগুনের ভেলা।

তারপর ?

মুখে সরু সরু চিরুণীর মত অজস্র হাড়ের ঝাঁঝরা। দুটো লোমশ পা, দুটো লোমশ হাত। দেহ নয়, যেন একটা ছোটখাট পাহাড়।

মার্ভিন বলে, পেরেরা কথা শুনে ভয় হচ্ছে। তিমিঙ্গিল বলে একটা জীবের নাম শুনেছি। যদি সেই হয় তাহলে—

ভয়ার্ত কণ্ঠে সকলে বলে, তাহলে ?

ভয়ের কথা। শুনেছি ওরা তিমিদেরও গিলে খায়।

যাইহোক আমি সাগরে নামছি। বিপদের সঙ্কেত পেলেই তোরা সঙ্গে সঙ্গে আমার টেনে তুলবি। যদি তিমিঙ্গিলই হয় তাহলে তাশিশ দুর্গ ছেড়ে পালাতে হবে অন্য কোথাও। তা নইলে কাউকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।

পেরেরা বলে, তাহলে আর জলে নেমে কাজ নেই মার্ভিন। ফিরে চল।

মার্ভিন কোমরে কাছি জড়াতে জড়াতে বলে, ভীতু কোথাকার। তোর যদি ভয় করে তুই পালা।

এরপর দুহাত কপালে ঠেকিয়ে সাগরে নামে মার্ভিন। পেরেরার হাতে কাছি। প্রথমে বেশ দ্রুতই কাছিটা ছোটে জলের নীচে। তারপর কাছির টান মন্থর হতে হতে শেষে স্থির হয়ে যায়।

পেরেরা বলে, যাই বলিস, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। পালালেই বোধহয় ভাল হ'ত।

সুমন নামে অপর একজন বলে, মার্ভিনকে ফেলেই পালাবি ?

পেরেরা কতদিন বেনতোতায় যায় নি। প্রায় বছরখানেক দেশ ছাড়া। মেয়েটার জন্যে মনটা কিরকম করে। ভাবছি দু'একদিনের মধ্যেই ঘরে যাব।

ঘরকুনো কোথাকার। যা, যা ভাগ।

সুমনের কথা পেরেরার কানেই ঢোকে না। ওর মন চলে গেছে বেন-তোতার ছোট্ট বাড়ীতে সেখানে ওর বুড়ো মা, বাপ আর ছোট্ট মেয়েটাকে রেখে টাকা রোজগার করতে চলে এসেছে। এ পথে আসতে চায়নি পেরেরা, কিন্তু একান্ত নিরুপায় হয়েই সে এই পথ বেছে নিয়েছে। অভাব যে কি তা পেরেরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তার চোখের সামনে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে গেল একমাত্র ছেলেটা। মেয়েটাও মরতেই বসেছিল বুড়ো মা-বাপের সঙ্গে, কিন্তু পেরেরা আর সহ্য করতে পারল না। কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে এল এখানে।

একটা দামী মুক্তো পকেটে রেখেছে পেরেরা। বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাবে। মেয়েটাকে দেবে।

বাড়ীর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল পেরেরা। হঠাৎ ওর মনে হল কাছিতে টান পড়ছে। সকলে মিলে টেনে তোলে মার্ভিনকে। কোমর থেকে ফাঁস খুলতে খুলতে মার্ভিন বলে, উজবুক। ওটা একটা উজবুক। এক নম্বরের মিথ্যুক। দৈত্য না হাতি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সকলে। মিথ্যুক পেরেরা ওদের কি ভয়ই না খাইয়ে দিয়েছিল।

না, না। কখখনো না। সত্যি বলছি, আমি নিজের চোখে দেখেছি। একটা বীভৎস জীব।

প্রতিবাদ করে পেরেরা। মার্ভিন বলে, তাহলে কি সেটা নিমেষের মধ্যে উপে গেল? তিমিঙ্গিল হলে এতক্ষণ আমাদের নৌকোটা থাকত, না আমরা থাকতাম?

সত্যি বলছি, মার্ভিন। তোরা বিশ্বাস কর।

সকলে হেসে ওঠে বিকট শব্দ করে। ওদের হাসির শব্দে পেরেরার কানে তালা লেগে যায়। দুহাতে কান টিপে ধরে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে পেরেরা, থাম। তোরা থাম।

আবার বিকট শব্দ করে ওরা হেসে ওঠে একসঙ্গে। হাসতে হাসতে একজন বলে, কাপুরুষ। সাগরে ডুব দিতে ওর যত ভয়।

আর একজন বলে, ওকে জোর করে আবার সাগরে নামিয়ে দেওয়া হোক। তিমিঙ্গিলে গিলে খাক্।

সঙ্গে সঙ্গে পেরেরার কোমরে কাছি বেঁধে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল একবারে ধারে। পেরেরা দুহাত দিয়ে বাধা দিতে দিতে বলে, মার্ভিন, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা। আমার কিছু হলে বুড়ো মা, বাপ আর ছোট্ট মা-মরা মেয়েটা শুকিয়ে মরবে।

স্বমন বলে, থাম বেটা ঘরকুনো কোথাকার। দলে আসার আগে ভাবা উচিত ছিল।

মার্ভিন বলে, নে, নে, আর দেরী করিস নে।

এরপর সবাই মিলে পেরেরাকে জোর করে ঠেলে দেয় জলে। শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেরেরা জলের ওপর পড়ে। নৌকোয় উঠতে যায় পেরেরা

কিন্তু দাঁড় নিয়ে সবাই তেড়ে যায়। কেউ মুখে চোখে সাগরের জল ছিটিয়ে দেয়। এইভাবেই ওরা 'নয়া আদমীদের' ভয় কাটায়। পেরেরা নতুন না হলেও সাগরে খুব কমই নেমেছে।

উপায় নেই। অগত্যা পেরেরা ডুব দেয় জলে। কাছি ধরে থাকে সুমন। কাছিটা ধীরে ধীরে নামে ভারত মহাসাগরের গর্ভে। এক সময় ফুরিয়ে যায়। কাছির প্রান্তটা সুমন ধরে থাকে দৃঢভাবে।

থাক বেটা। সহজে তুলছি না।

মার্ভিন বলে, বেটা মুখে চুন কালি মাখিয়ে ছাড়বে।

সুমন বলে, গল্পটা বানিয়েছে খাসা। একটা বীভৎস, কদাকার, প্রকাণ্ড মুখ। ঠিক যেন দৈত্য। চোখ নয়, যেন আগুনের ডেলা।

হেসে ওঠে সকলে একসঙ্গে। তাদের হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই নড়ে ওঠে সুমনের হাতের কাছি। তাই দেখে আরও বিকট শব্দ করে হেসে ওঠে মার্ভিনরা। সুমন বলে, ভয় পেয়েছে বেকুবটা। থাক বেটা আর কিছুক্ষণ। তারপর তুলব।

মার্ভিন মন্তব্য করে, দড়িটা কিরকম নাড়াচ্ছে দেখছিস। মহামেঘ-কানন থেকে শ্রীমহাবোধিবৃক্ষের পাতা এনে মাদুলি তৈরি করে ওর গলায় বাঁধতে হবে। তবে যদি ওর ভয় কমে।

সুমন বলে, তাজ্জব! তাজ্জব ব্যাপার হে মার্ভিন! শ্রীমহাবোধিবৃক্ষের নাম করতেই কাজ। কাছিটা আর নড়ছে না।

নে, এবারে টেনে তোল। বেটা বেশ জব্দ হয়েছে।

মার্ভিনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মিলে টান দেয় কাছি ধরে। কিন্তু টান দেবার সঙ্গেসঙ্গে সকলের মুখের চেহারাই যেন পালটে যায়। বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ। কাছিটা বড় হাল্কা। দ্রুত উঠে আসছে ওপরে। কাছির আর এক প্রান্ত উঠে এল। তবে পেরেরা নেই। কে যেন একটা ভোতা ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছে দড়িটাকে।

॥ ১২ ॥

পেরেরা সাগর থেকে উঠলো না। ব্যাপারটা চাপা রইলো না। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। কেউ ঘটনাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করল, কেউ ভাবল আজগুবী কাহিনী।

কিন্তু তারপর আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটা ভয়ের হাওয়া বইতে লাগল। মাঝিমাল্লা সকলেই বেশ সন্ত্রস্ত। ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে উঠলো যখন কিছু কিছু ব্রিটিশ লাইনার আর বিদেশী কার্গো শিপের নাবিকরা তিমিজাতীয় একটা জীবের ওপর একটা মানুষকে প্রত্যক্ষ করল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে গেল সারা পৃথিবীর দৈনিক কাগজগুলোর মধ্যে।

আর যায় কোথা। অজানাকে জানবার জন্যে প্রান পর্যন্ত দিতে ইচ্ছুক এমন অনেক লোক আছে পৃথিবীতে। যাই হোক গ্রীনল্যাণ্ড আর নরওয়ের দিক থেকে কখানা হোয়েলিং ফ্লীট, ব্রিটেনের দুটো হোয়েল ক্যাচার সাগরে ভাসল। গন্তব্যস্থল ভারত মহাসাগর।

হুজুকে কোলকাতা। কাগজে খবরটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তুফান বইতে লাগল সর্বত্র। কজন অতি উৎসাহী যুবক নেচে উঠলো, তারা তিমিঙ্গিলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। শংকর এদের মধ্যে একজন। সে সত্যানুসন্ধানী, সাহসী আর উৎসাহী। কিন্তু পয়সা? ভারত মহাসাগরের বুকে যেমন তেমন একটা অভিযান চালালেও বেশ কিছু টাকা চাই। কিন্তু দমে গেল না শঙ্কর। ও জানে এইরকম উদ্দেশ্যমূলক অভিযান টাকার অভাবে বন্ধ হতে পারে না।

দিন তিনেকের মধ্যেই শঙ্করের ধারণা সত্যি হল। ওদেরই পাড়ার খোকন বাবু শঙ্করকে ধরে বসলো ওকে সঙ্গে নিতে হবে। টাকার জন্যে চিন্তা নেই। যাক্। শঙ্করের একটা ভাবনা গেল। টাকার জন্যে চিন্তা নেই। অবশ্য তার জন্যে হাঁদারাম খোকনবাবুকে সঙ্গে নিতে হবে। বুদ্ধি বড্ড হাল্কা। খোকনবাবুর ইচ্ছে সাগর থেকে মুক্তো আনবে। যাইহোক এরপর চাই ক্যাপটেন। শঙ্করের এক বন্ধু থাকে ভিশাখাপত্তমে। জাহাজ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। অবসর সময়ে কি একটা ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে। বন্ধুটির নাম রঞ্জন। পরে অবশ্য শঙ্কর জানতে পেরেছিল ব্যাথিস্কিয়ারের মতো রঞ্জনও নাকি একটা যন্ত্র তৈরী করেছে। নাম দিয়েছে রঞ্জন ক্যাথিশেল। যন্ত্রটাকে তখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি শঙ্করের। পরে দেখেছিল। বেলুনের মতো গোল নয়। অনেকটা রকেটের মতো। পেটটা মোটা। গায়ে একটা জানলা আছে। বিপদে পড়লে শত্রুকে নিধন করতে অস্ত্র নিক্ষেপ করার জন্যে গায়ে আর একটা ঢাকনাযুক্ত পথও আছে।

নির্গমন পথের ঢাকনাটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো। অস্ত্র নির্গমনের পর

সেকেণ্ডের মধ্যে সেটা আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়ে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায় নির্গমনের পথ। এছাড়া ব্যাথিস্ফিয়ারের মত এর সঙ্গেও আছে সার্চলাইট। টেলিফোনে ওপরের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করা আছে।

শঙ্কর বন্ধুকে তার মনের কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখল, আর সেই সঙ্গে জানাল সে যদি কিছু দিনের জন্যে একটা বড় ট্রলার ভাড়া করতে পারে তাহলে খুব ভাল হয়। তার চিঠি পাবার পর নির্দিষ্ট দিনে ভিজাগাপত্তনম থেকেই ট্রলারটা ছাড়বে তাদের সকলকে নিয়ে। ট্রলারটায় বেশ কখানা কামরা থাকা বাঞ্ছনীয়।

রঞ্জনকে চিঠি ছাড়ার পর শঙ্কর ছুটল ওর এক দূর সম্পর্কের মামার কাছে। মামার এক ছেলে একটা লাইনারের ক্যাপটেন। নাম নারায়ণ। বয়স অল্প তবে এরই মধ্যে বহুদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে ভূগোল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মাত্রাটা বেশ বেড়ে গেছে।

চাকরিতে পদোন্নতি হবার পরই নারায়ণ বাড়ীর সকলের কাছে হারালো তার পৈতৃক নামটা। সকলেই ক্যাপটেন বলে ডাকে। এমনকি পাড়ার সকলেও। শঙ্কর শুনেছে ক্যাপটেনের লাইনার দেশে ফিরেছে। এখন মাস তিনেক ছুটি। শঙ্কর গিয়ে ধরতেই ক্যাপটেনও রাজী হল।

এর কদিন পরেই রঞ্জনের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। চিঠি খুলেই শঙ্কর একরকম লাফিয়ে উঠলো। তার আশা পূর্ণ হতে চলেছে। অজানাকে জানবার আগ্রহ ওর ছোটবেলা থেকে। কিছুদিন পরেই খোকনবাবুকে নিয়ে শঙ্কর রঞ্জনের বাসায় গিয়ে উঠলো। ঠিক হল ২রা অক্টোবর তাদের ট্রলার ছাড়বে। পাইলট, খালাসী এসব যোগাড় করেছে রঞ্জনই, তাই ও নিয়ে শঙ্করকে আর চিন্তা করতে হল না।

এদিকে খোকনবাবুর মুখ থেকে চতুর্দিকে তাদের অভিযানের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এর ফল অবশ্য খুবই খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে ওরা কেউই কিছু বুঝতে পারেনি, আর পরেও কিছু বুঝতে পারেনি, বা কিছু করার ছিল না।

সব ঠিকঠাক। আর একদিন পরেই যাত্রা সুরু হবে। জিনিসপত্র জাহাজে তুলছে ওরা, ক্যাপটেন লিস্ট ধরে মিলিয়ে দেখছে। এমন সময় একজন খালাসী এসে শঙ্করকে খবর দিল একজন লোক প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তার খোঁজ করছে। লোকটা জেটির একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেখতে কালো, বেঁটে। দেহটা বেশ মজবুত। আর সবচেয়ে বিশ্রী আর ভয়ংকর নাকি ওর চোখদুটো।

শঙ্করকে দেখে লোকটা এগিয়ে গিয়ে বলে তার নাম উন্নি। বাড়ি আলেপ্পি। এরপর শঙ্করকে সে তার দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল। তার এক ভাইপো তিরুনাল বাবার সঙ্গে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। বাপটাও ছেলের শোকে মরে যায়। সে আজ দশ বছর আগের কথা। তারপর তিরুনালকে অনেকেই নাকি সাগরে দেখেছে। বাপ-মা-মরা ছেলেটার জন্যে তার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তারই খোঁজে সেও সাগরে যেতে চায়। যদি দেখা পায় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবে।

এইভাবে উন্নি তার নিজের দোষ আর মনের গোপন কথাটাকে চেপে একটা মিথ্যে গল্প শোনাল। আসলে ওর মনে হয় তিরুনাল বেঁচে থাকলে একদিন হয়তো ফিরে এসে বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নেবে। তাই চুপ করে থাকা যায় না। পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলতেই হবে। সবশেষে উন্নি আছড়ে পড়ল শঙ্করের পায়ে, হুজুর আমাকে দয়া করে জাহাজে একটু ঠাঁই না দিলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। আমি জেলের ছেলে হুজুর। আপনাদের অনেক উপকারে লাগতে পারি।

শঙ্করের মনটা গলে গেল উন্নির দুঃখে। ভাবল, আহা, ভাইপোর শোকে লোকটা বাড়িতে স্থির থাকতে পারছে না। একজনই তো। হয়ে যাবে একটা জায়গা।

উন্নি ঠাঁই পেল জাহাজে।

১৯৪৪ সালের ২রা অক্টোবর। একটা ভাড়া করা ট্রলার ভিজাগাপত্তনম থেকে ছুটল দূর সাগরের দিকে। ঠিক সেই দিনই কাগজের একটা খবরের ওপর চোখ পড়তেই জাহাজের সকলেরই বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

রঞ্জন ব্যাথিশেল যন্ত্রটাকে নিয়েই ব্যস্ত। ক্যাপটেন ডেকের ওপর ঠিক বৈদ্যুতিক জলটেলিফোনের (যা দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়) পাশেই দাঁড়িয়ে। দুচোখের দৃষ্টি নীল আকাশটা যেখানে নীল সাগরে মিশেছে সেই দিগন্তে নিবদ্ধ। ঠিক এই সময় শঙ্কর একরকম ছুটতে ছুটতে এসে তার কাছে দাঁড়ায়। ক্যাপটেন অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে শুধোয়, কি ব্যাপার, শঙ্কর ?

আজকের কাগজ পড়েছ ?

না। কি ব্যাপার?

শঙ্কর কাগজটা ক্যাপটেনের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে, এই যে, এই জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে নাও।

খবরের কাগজের ওপর চোখ পড়তেই ক্যাপটেনের কপালটা কুঁচকে ওঠে।

...অবশেষে আরব সাগরের আতঙ্ক বঙ্গোপসাগরেও ছড়িয়ে পড়ল। কার নিকোবর থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে, চাওরার কাছে তিমিঙ্গিলের আবির্ভাব। টেরেসা থেকে হাঁড়ি তৈরীর মাটি নিয়ে প্রায় দশখানা ক্যানো ফিরছিল। হঠাৎ তিমিঙ্গিলের আক্রমণে অর্ধেকেরও বেশী ক্যানো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সাগরে তলিয়ে যায়। নাবিকেরা নিখোঁজ। অবশিষ্ট ক্যানোগুলো ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। ওখানকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, নাবিকেরা তিমিঙ্গিলের পিঠে শিম্পাঞ্জীর মত একটা অদ্ভুত জীবকে নাকি দেখতে পেয়েছে।

কাগজখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্যাপটেন ডেকের ওপর ক'সেকেণ্ড পায়চারি করে তারপর বলে, উপস্থিত আমাদের আন্দামানের দিকেই জাহাজের মুখ ফেরাতে হবে।

ক্যাপটেনের নির্দেশ পেয়ে জাহাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল আন্দামানের দিকে।

॥ ১৩ ॥

পরের দিন ক্যাপটেনের কেবিনে রঞ্জন, শঙ্কর আর ক্যাপটেনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলছিল। ঘরে খোকনবাবুও ছিল, আর উন্নি দরজার ঠিক পাশ থেকে লুকিয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা।

তর্কটা সুরু হয় রঞ্জনের কথা দিয়েই।

ক্যাপটেন, মনে হয় আমরা ভুল করছি।

ক্যাপটেনের হাতে চুরুট। চুরুটের মুখ থেকে সরু সুতোর মত ধোঁয়াটা এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। তার তীব্র গন্ধে ক্যাপটেন ছাড়া সকলেরই নাক কুঁচকে উঠছে। রঞ্জনের কথায় ক্যাপটেন বিরক্ত হয়।

কেন, ভুল করছি কেন?

মনে হচ্ছে অনিশ্চিতের পিছু ছুটছি আমরা। জীবটার গতিবিধি জানা দরকার। তা নইলে সুদূর আন্দামান পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে হবে।

তুমি ভুল করছ রঞ্জন। আমি জানি ঐ ধরণের জীব যখন হঠাৎ কোনো জায়গায় গিয়ে হাজির হয় তখন বেশ কিছু দিন সেখানে উৎপাত চালায়। সুতরাং চাওরার দিকে গিয়ে আমরা ভুল করছিনা।

তাড়া খেয়ে জীবটা ভারত মহাসাগর হয়ে আবার আরব সাগরে ফিরে যেতে পারে। আবার দক্ষিণ মহাসাগর বা আটলান্টিকেও পালাতে পারে।

এই সময় খোকনবাবু ফোড়ন কাটে, যদির কথা গদির তলায় থাক বাপু। হাওড়া আমরা যাবই।

শঙ্কর বলে, হাওড়া! হাওড়া এল কোথা থেকে?

কেন আমরা তো হাওডার দিকেই যাচ্ছি।

ক্যাপটেন বলে, হাওড়া নয় চাওরা। জাহাজে হাওড়া থেকে চাওরা যেতে চার দিনেরও বেশী সময় লাগবে।

চারদিন! বিরাট কাণ্ড! জায়গাটা তাহলে এডিনবরার কাছে?

খোকনবাবুর ভূগোলের জ্ঞান দেখে সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই ক্যাপটেন বলে, এডিনবরা এখানে কোথায়? সে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে। স্কটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ নগর। চাওরা কার-নিকোবরের কাছে।

ওখানে একটা বিরাট জেলখানা আছে শুনেছি। কি যেন নামটা?

সেটা আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে। সেলুলার জেল। সাত সাতটা ব্লক। ভেতরে অজস্র সেল।

বিরাট কাণ্ড! শুনেছি ওখানে নাকি রাক্ষস থাকে। মানুষ দেখলেই টুপ করে পিলের মতো গিলে খায়।

রাক্ষস নেই, তবে আন্দামান নিকোবরের জানোয়াররা যেমনি হিংস্র, তেমনি নিষ্ঠুর। দেখতে বেঁটে। মজবুত দেহ। উলঙ্গ আর ঘোর কালো।

বিরাট কাণ্ড। তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই। ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

ভয় কি, খোকনবাবু। আমাদের সঙ্গে বন্দুক, কামান সব রয়েছে। তাছাড়া ওদের আর এক গোষ্ঠী ওঙ্গীরা এখন একটু সভ্য হয়েছে। আর আমরা যাচ্ছি চাওরার কাছে। চাওরা একটা ছোট্ট দ্বীপ। সমস্ত আন্দামান নিকোবরে দুশোর বেশী ছোট বড় দ্বীপ।

বিরাট কাণ্ড! তাহলে ভয় নেই কি বল?

ততটা ভয় নেই যতটা ভাবছ। নিকোবরীদের কাছে চাওরা তীর্থস্থান। পাঁচটা গ্রাম নিয়ে এই দ্বীপ। নিকোবরের লোকেরা চাওরার তৈরী হাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো জায়গার হাঁড়ি নেবে না। ওদের বিশ্বাস অন্য জায়গার তৈরী হাঁড়ি নিলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়বে।

অপদেবতা! দুর্গা-দুর্গা। একদিকে জারোয়ারা, অন্যদিকে ভূত-প্রেতেরা। তবে রাক্ষস যখন নেই তখন ভয় নেই কি বল?

ভরসাও নেই।

কেন? কেন?

চাওরার লোকেদের সবাই ভয় খায়। ওখানে দুদিনের বেশী কেউ থাকে না। ভয়ে পালিয়ে আসে।

ভয়!

ওদের স্বভাব সন্দিগ্ধ। যদি মনে করে কোনো লোককে ভূতে পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওরা সেই লোককে হত্যা করে নির্মমভাবে।

বিরাট কাণ্ড!

আর ওদের সবচেয়ে বেশী রাগ আমাদের মতো বিদেশীদের ওপর। ওদের ধারণা বিদেশীরা এলেই ওদের খাদ্যে ভাগ বসাবে।

বিরাট কাণ্ড! আমি জাহাজ থেকে নামছি না মোটেই।

শঙ্কর হেসে বলে, ভয় কি খোকনবাবু। আমরা খুব দরকার না হলে দ্বীপে নামব কেন? আমরা যাচ্ছি তিমিঙ্গিলের সন্ধানে।

সে তো বটেই, সে তো বটেই। তিমিঙ্গিল কি জীব, ক্যাপ্টেন?

চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি ওরা তিমিদেরও গিলে খায়।

সে তো খাবেই। খাবে না? ওরা বাঁচবে কি করে। এ আর এমন কি ব্যাপার।

এমন কি ব্যাপার! এক একটা তিমির ওজন কত জান?

একশ টনেরও বেশী হতে পারে। আর একটা বড় হাতির ওজন মোটে পাঁচ টন।

বিরাট কাণ্ড! তাহলে আমাদের জাহাজটাকেও তো গিলে খেতে পারে।

হাসতে হাসতে ক্যাপটেন বলে, তা পারে।

এঁ্যা, বল কি! দুর্গা-দুর্গা।

এই সময় রঞ্জন বলে, ক্যাপটেন, সত্যিই কি তিমিঙ্গিলের কোনো অস্তিত্ব আছে ?

কি জানি। সমস্ত মহাসাগর গুলোতে জল আছে ৩৫ কোটি ঘন মাইল। ডাঙার সব মাটি, পাহাড় যদি সাগরে ফেলা হয় তাহলে সাগরের খুব অল্পই বুজবে। এর পরও গভীরতা থাকবে হাজার ফুটের ওপর। এই বিশাল সমুদ্র গর্ভে তিমিঙ্গিল বা ঐ ধরণের জীবের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।

শঙ্কর বলে, দ্য লেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ শুনেছি সবচেয়ে গভীরতম স্থান।

ঠিকই। গুয়াম দ্বীপের ২০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই ভয়াবহ টেঞ্চটা। এখানে সাগরের গভীরতা ছত্রিশ হাজার ফুটের ওপর। এভারেস্টও এখানে তলিয়ে যাবে।

চমকে ওঠে খোকনবাবু, বিরাট কাণ্ড ! আমরা তাহলে অগাধ জলে !

ক্যাপটেন বলে, হ্যাঁ, আবার বলতে পার আমরা রত্নখনির ওপরেও।

খোকনবাবুর চোখদুটো চক্ চক্ করে ওঠে। আসলে খোকনবাবুর মনের ইচ্ছে সাগর থেকে দামী দামী মুক্তো সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া। তবে কথাটা এত দিন ধরে মনে চেপে রেখেছে খোকনবাবু। রত্নের কথা শুনেই বলে ওঠে, রত্নখনি ! সেটা কোনখানে, ক্যাপটেন ?

সর্বত্র। সাগরে শুধু মুক্তোই পাওয়া যায় না। সাগরের জলও কম দামী নয়। প্রতি ঘন মাইল জলে সোনা আছে ১৬ সেরের ওপর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল খোকনবাবু। ক্যাপটেন ধরে ফেলে। দুচোখ বড় বড় করে বলে, বিরাট কাণ্ড ! তাহলে মুক্তোর দরকার নেই। বাড়ি ফিরে আমি সাগরের জল থেকে সোনা তৈরী করার একটা ফ্যাক্টরী গড়ব।

হাসে ক্যাপটেন।

সোনার যা দাম তার চেয়েও অনেক বেশী খরচ পড়ে যাবে খোকনবাবু।

খোকনবাবু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, বুঝেছি।

শঙ্কর বলে, কি বুঝলে ?

সেই যে একটা পদ্য আছে, ওয়াটার, ওয়াটার—

তারপরে কি যেন ?

এভরি হোয়্যার,
বাট নট্ এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।

॥ ১৪ ॥

৯ই অক্টোবর।

তীব্রবেগে ছুটছে ট্রলারটা। দুপুরের দিকে শঙ্করের দূরবীণে ছোট্ট একটা দ্বীপ বিন্দুর মত ফুটে উঠলো। শঙ্কর একরকম লাফাতে লাফাতেই বলল, চাওরা। এসে গেছি! এসে গেছি।

জলের ওপর জীবনটা একঘেয়ে হয়ে উঠছিল সকলের। ডাঙার জন্যে ছটফট করছিল প্রাণ। শঙ্করের চিৎকারে ক্যাপটেন, রঞ্জন, খোকনবাবু আরও অনেকে ছুটে আসে। ক্যাপটেন দূরবীণ লাগিয়ে ভাল করে দেখে বিন্দুটাকে। এরপর ফিরে যায় নিজের কেবিনে। একটা মানচিত্র নিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই আবার এসে হাজির হয়।

মানচিত্রের ওপর চোখ রাখে ক্যাপটেন বেশ কিছুক্ষণ, তারপর ওটা গুটোতে গুটোতে বলে, ওটা চাওরা নয়। খুব সম্ভব বাট্টিমালভ দ্বীপ। চাওরা ওখান থেকে আরও কুড়ি মাইল।

খোকনবাবু বলে, ওখানেও কি জারোয়ারা থাকে? ক্যাপটেন বলে, না। বাট্টিমালভ একটা ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপটা বড় বড় সামুদ্রিক পাখীদের আড্ডার জায়গা।

রঞ্জন বলে, ভালই হল। অনেকদিন মাংসের মুখ দেখিনি। ওখানে দু, একটা পাখী মারলে রাতের খাওয়াটা জমবে ভাল।

রঞ্জনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে ওঠে খোকনবাবু, তিমিঙ্গিল! তিমিঙ্গিল! বাঁচাও।

এরপর দাপাদাপি সুরু করে ডেকের ওপর। ক্যাপটেন, শঙ্কর আর আর রঞ্জনেরও দৃষ্টি যায় সাগরের ওপর। একটা বিশ্রী জীব ছুটে আসছে ট্রলারটার দিকে। মাথাটা ঠিক হাতুড়ির মত।

ক্যাপটেন আর রঞ্জন একসঙ্গেই বলে ওঠে, হ্যামার হেড্, শার্ক। হাতুড়ি-মাথা হাঙর।

শংকর বলে, শুনেছি ওরা ভয়ানক হিংস্র।

অবাক চোখে সকলে চেয়ে থাকে হাঙরটার দিকে। জীবটার মাথাটা আড়াআড়িভাবে বসানো একটা হাতুড়ির মত। তার দুপাশে দুটো চোখ।

গায়ে আঁশ নেই। মাঝে মাঝে গুলের মত গোলাকার স্ফীত অংশ। সাগরের ওপর অনেকটা অংশই ভেসে উঠেছে। প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে হাঙরটা ট্রলারটার পিছু পিছু।

চিৎকার করে ওঠে শঙ্কর, ক্যাপটেন, হাঙরটা যেভাবে ছুটে আসছে মনে হচ্ছে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

রাক্ষসটা জাহাজটার ক্ষতি করতে পারে?

ক্যাপটেন পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

হ্যাঁ, একটা কিছু করতে হবে। মনে হচ্ছে রাক্ষসটার পেটে অনেকক্ষণ কিছু যায় নি।

কাঁপতে আরম্ভ করে খোকনবাবু, সেইজন্যেই আমাদের পিছু নিয়েছে।

কথাটা বলেই খোকনবাবু একটা কমলালেবুর প্রায় সবটাই মুখে পুরে দেয়। আসবার সময় বেশ কিছু লেবু নেওয়া হয়েছিল। খোকনবাবু তা থেকেই একটা নিয়ে চুষতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ যায় সাগরের দিকে। তারপরই এই কাণ্ড।

খোকনবাবুর হাতের দিকে চোখ যেতেই চিৎকার করে ক্যাপটেন, দি আইডিয়া।

এরপর ক্যাপটেন উন্নিকে বলল কিছু কমলালেবু আনতে। এদিকে হাঙরটা একবার সজোরে লেজের ঝাপটা মারল। ট্রলারটা টলে ওঠে একবার। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার আর চেঁচামেচিতে ভরে ওঠে ট্রলারটা। অনেকেই ঠাকুরের নাম জপতে সুরু করে দেয়।

ফিরে আসে উন্নি। দুহাতে কমলালেবু। ছুটে আসছে হাঙরটা তীব্র গতিতে। ক্যাপটেন একটা লেবুর খোসা ছাড়ায়। রাক্ষসটা যখন হাত চারেক দূরে তখন ক্যাপটেন খোসা ছাড়ানো লেবুটা ছুঁড়ে দেয় তার মুখের সামনে। লেবুটাকে নিমেষের মধ্যে গিলে ফেলে আবার পিছু ধাওয়া করে জীবটা। ক্যাপটেন একটার পর একটা লেবু ছুড়তে থাকে। রঞ্জন বুঝল এভাবে বেশীক্ষণ হাঙরটাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাছাড়া সব লেবুগুলোও, শেষ হয়ে যাবে আধঘণ্টার মধ্যে।

ক্যাপটেন, ওটাকে এভাবে ঠেকিয়ে রাখতে গেলে একটা লেবুও থাকবে না।

ক্যাপটেনও বুঝতে পারল তার ভুল। তাই লেবু ছোঁড়া বন্ধ করে দিল।

এদিকে লোভী হাঙ্গরটা লেবু না পেয়ে আরও দাপাদাপি সুরু করল। এরপর হয়তো ট্রলারটাকে ডুবোবার চেষ্টা করবে।

রঞ্জনের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব আসে। সে ছুটে যায় স্টোররুমে; তারপর দেখেশুনে একটা খালি টিন যোগাড় করে ছুটে আসে ডেকের ধারে। এদিকে রাক্ষসটা তখন বিকট 'হাঁ' করে ছুটে আসছে ট্রলারটার দিকে। রঞ্জন সকলকে অবাক করে দিয়ে টিনটা ছুঁড়ে দেয় জলে। টিনটাকে গিলতে গিলতেই সাগরে ডুব দেয় হাঙ্গরটা।

॥ ১৫ ॥

ঝক্-ঝক্—ঝক্—ঝক্—। এগিয়ে চলে ট্রলারটা। বাট্টিমালভ দ্বীপে থামল না আর। ক্যাপ্টেনের মত, এ অঞ্চল ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়াই ভাল। না গেলে হাঙ্গরের দল এসে জাহাজ আক্রমণ করতে পারে।

কিন্তু প্রবাদ আছে দুর্ভাগ্য একা আসে না। বৈকাল চারটের সময় দক্ষিণ দিকে এক টুকরো মেঘ দেখা গেল। একজন খালাসী ছুটতে ছুটতে এসে ক্যাপটেনকে জানায়, সর্বনাশ হুজুর।

কি ব্যাপার ?

আকাশে মেঘ। ঝড় উঠতে পারে।

মেঘের নাম শুনে ক্যাপটেন যেভাবে বিচলিত হয়ে উঠলো হাঙ্গরের নাম শুনে বোধহয় তার অর্ধেকও বিচলিত হয় নি। দূরবীন নিয়ে ঝড়ের বেগে বাইরে আসে ক্যাপ্টেন। চোখে দূরবীণ লাগাতে হল না, খালি চোখেই দেখতে পায় ক্যাপ্টেন একটা কালো মেঘ ফুঁসতে ফুঁসতে দ্রুত দিকচক্রবাল থেকে মাথা ঠেলে উঠছে।

খোকনবাবু কাছেই ছিল। মেঘের নাম শুনেই দৃষ্টি চলে যায় দূরে, দিকচক্রবালের কাছে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে খোকনবাবু, মেঘ মেঘ। কি সুন্দর মনে হচ্ছে সাগরের বুক চিরে একটা পর্বত উঠছে।

ক্যাপ্টেন কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ডেকের ওপরে। মাঝে মাঝে পায়চারি থামিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কালো মেঘটাকে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর আবার পায়চারি সুরু করে।

সাগর থেকে বেশ কিছুটা ওপরে উঠেছে মেঘটা। আবহাওয়ার মধ্যে

ক্যাপটেন কিসের যেন গন্ধ পায়। চঞ্চল হয়ে পড়ে ক্যাপটেন। দ্রুত ইঞ্জিন-রুমের দিকে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে বেশ আলোড়ন দেখা দেয়। খালাসীরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। ক্যাপ্টেনও ত্রস্ত পায়ে একবার এখানে একবার ওখানে যায়। শংকরও ক্যাপটেনের সঙ্গে ছুটোছুটি করে। রঞ্জন ওর ব্যাথিশেল যন্ত্রটাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জমাট কালো মেঘের টুকরোটা ছড়িয়ে পড়ে আকাশময়। সাগরের জলের মধ্যেও কিরকম একটা অস্থিরভাব লক্ষ্য করে ক্যাপটেন। বুঝতে পারে ঝড় উঠতে দেরী নেই। সকলকে নিজের নিজের কেবিনে ঢুকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয় ক্যাপ্টেন। খোকনবাবু তখনও বাইরে।

একবার শংকর ছুটতে ছুটতে এসে তাকে সাবধান করে দেয়, শীঘ্রি কেবিনে ঢুকে পড় খোকনবাবু। এখনই ঝড় উঠবে।

কথাটা বলেই শংকর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না, একরকম ছুটতে ছুটতে গিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ে।

তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল খোকনবাবু সাগরের রং কেমন পালটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করতে করতে ঝড় এসে আছড়ে পড়ে ট্রলারের ওপর। ছিটকে পড়ে খোকনবাবু ডেকের ওপর। ভাগ্যক্রমে হাতের কাছেই ছিল একটা খুঁটি। কাপড়ের একটা প্রান্ত দিয়ে নিজেকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধে তারপর চেঁচাতে সুরু করে, ক্যাপ্টেন—, শঙ্কর—কে কোথায় আছ বাঁচাও—।

ঝড় সুরু হল। মোচার খোলার মতো দুলছে ট্রলারটা। ভেতরের ভয়ার্ত কোলাহল এক কেবিন থেকে অন্য কেবিনে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে যে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। কেউ আবার ঠাকুরের কাছে মানত করে, দু'একজন আত্মীয়-স্বজনের নাম ধরে মরা কান্না সুরু করে দেয়।

সাগরের ঢেউগুলো ঝড়ের আস্বাদ পেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফুলে ফেঁপে পর্বতের আকার ধারণ করে। তারপর ছুটোছুটি আরম্ভ করে বুকে। ওদিকে খোকনবাবু তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও—,বাঁচাও—।' কিন্তু কে কাকে বাঁচায়। সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

হঠাৎ ক্যাপটেনের সুতীক্ষ্ণ গলা ভেসে আসে খোকনবাবুর কানে, ওয়াটার স্পাউট। জলস্তম্ভ। সাবধান, জাহাজের মুখ ঘোরাও।

খোকনবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল। ক্যাপ্টেনের গলার স্বর কানে আসতেই মনে সাহস আসে, ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই যে দৃশ্য দেখতে পায় তাতে ভয়ে চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। হাতির শুঁড়ের মত লম্বা, কালো, ঘনীভূত বাষ্পের একটা ঘূর্ণায়মান চুঙ্গী বা গোল থাম কালো মেঘের রাজ্য থেকে বিস্তৃত হয়ে নেমে এসেছে সাগরে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। খোকনবাবু ভাবে মেঘ থেকে সমস্ত বৃষ্টির জল ঐ চুঙ্গী দিয়ে এসে হুড়হুড় করে সাগরে পড়ছে।

ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় খোকনবাবু। ওদিকে ক্যাপটেন চিৎকার করছে, সাবধান জলস্তম্ভ। জাহাজের মুখ ঘোরাও। তা নইলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জাহাজ।

বিরাট কাণ্ড!

খোকনবাবু আপনমনেই বলে কথাটা, তারপর ক্ষীণ স্বরে ক্যাপ্টেনকে ডাকে, ক্যাপ্টেন আমি এখানে।

কিন্তু খোকনবাবুর গলা ক্যাপ্টেনের কানে পৌছয় না। ক্যাপটেন চিৎকার করছে, ফায়ার, ফায়ার। কামান দাগ। পাইলট—, পাইলট—

এগিয়ে আসছে জলস্তম্ভটা। ভয়ে খালাসী, পাইলট সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। আর বুঝি রক্ষে নেই। এখনই ঐ ভয়াবহ থামটা জাহাজটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে আছাড় মারবে সাগরের জল।

ভয়ে ক্যাপটেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। চম্বুক যেমন লোহাকে টানে ভয়াবহ চুঙ্গীটাও ঠিক তেমনি টানছে জাহাজটাকে।

এবারে সলিল সমাধি।

জাহাজের কামরার মধ্যে মানুষগুলো একবার এ দেওয়ালে, একবার ও দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, আর ছাগল, ভেড়ার মত চিৎকার করছে। কিন্তু সকলের গলা ছাপিয়েও ক্যাপটেনের গলা শোনা যায়, ফায়ার, ফায়ার। কামান দাগ।

দ্রাম। দ্রাম। হঠাৎ সকলকে সচকিত করে প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে যায় কামানের গোলা। মুহূর্তের মধ্যে প্রলয়ঙ্করী চুঙ্গীটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

চিৎকার করে লাফাতে আরম্ভ করে ক্যাপটেন, নাউ দ ক্রাইসিস ইজ্ ওভার। বিপদ কেটে গেছে। ভয় নেই, আর ভয় নেই।

॥ ১৬ ॥

ঝড় থামার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারধারে। ক্যাপটেন ঘুরে ঘুরে সকলের খোঁজ নেয়। সব ঠিক, শুধু খোকনবাবুর খোঁজ পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দেখা মিলল না। শঙ্করের মনটা খারাপ হয়ে যায়। সকলেই ভাবে খোকনবাবু নিশ্চয়ই ঝড়ের সময় ছিটকে সাগরের জলে পড়েছে। বিষণ্ন মনে ক্যাপটেনের ঘরে অনেকেই যখন খোকনবাবুর আলোচনায় ব্যস্ত এমন সময় রাঁধুনী ঠাকুর প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘরে ঢোকে। সকলের দৃষ্টি যায় সেদিকে। কি যেন বলতে এসেও বলতে পারছে না। লোকটা। ক্যাপটেন এগিয়ে যায়, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে বলে, কি ব্যাপার ঠাকুর ?

ঠাকুর অতিকষ্টে বলে, ভূ—উ—ত

ভূত! কোথায় ?

ঠাকুর হাত দিয়ে গুদাম ঘরটা দেখায়। সকলে একসঙ্গে ছোটে গুদামঘরের দিকে। ক্যাপটেনের হাতে টর্চ। গুমাদ ঘরের লাইটটা অন করে দেয় ক্যাপটেন। কিন্তু না, কেউ নেই। টর্চ জেলে ড্রাম আর টিনগুলোর চারপাশ দেখে কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। ঠাকুরকে বেশ ভৎ´সনা করে, ক্যাপটেন সদলবলে কেবিনে ফিরে যায়।

রাতের খাবার তৈরী করতে হবে। তাই গুদাম ঘরে ঢুকে আনাজ বের করছিল ঠাকুর। কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপটেনরা ফিরে যেতেই ঠাকুরও পালিয়ে আসে। অনেককেই অনুরোধ করে তার সঙ্গে গুদাম ঘরে যাবার জন্যে, কিন্তু কেউ রাজী হয় না। শেষে গংগলু নামে একজন খালাসীকে রাজী করায়। গুদাম ঘরের কাছে এসে গংগলুকে এগিয়ে দিয়ে ঠাকুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। সাতপাঁচ না ভেবে ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়ে গংগলু, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে বাইরে।

কি ব্যাপার রে গংগলু, ফিরে এলি যে বড় ? ভয় পেয়েছিস ?

ভয় ? না—, ভয় কি। ও কিছু নয়।

কিছু নয় ?

না, কিছু নয়। শুধু মনে হল—

কি মনে হল রে, গংগলু ?

মনে হল কাঁকা ডেরামটা—

ডেরামটা—

হেঁটে বেড়াচ্ছে।

কথা শুনে ঠাকুরের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একবার ঢোক গিলে বলে, ফাঁকা ডেরামটা হেঁটে বেড়াচ্ছে ?

হ্যাঁ, হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ধ্যেৎ, তাই হবার হয় না কি। ডেরামের কি পা আছে যে হেঁটে বেড়াবে। তুই ভুল দেখেছিস! চল, ভেতরে চল।

ভেতরে! তুমি আগে চল ঠাকুর।

আগে পিছে আবার কি আছে রে গংগলু। যেতে যখন হবেই তখন আগে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া শুনেছি—

কি শুনেছ ঠাকুর ?

ওদের হাত খুব লম্বা হয়। আর ওরা পিছু থেকেই ধরতে সুরু করে। কারণ পিছনের লোকেরা পালায় তো।

তাহলে কি হবে, ঠাকুর ?

চল, আগে চল।

একরকম জোর করেই ঠাকুর গংগলুকে ঠেলে দেয় ঘরের মধ্যে। কিন্তু দ্বিগুণ জোরে গংগলু ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

গংগলু কিছু দেখলি ?

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করে গংগলু, উনি হাঁটছেন।

উনি কে ?

ডেরাম ভূত।

প্রথমে ক্যাপটেনকে ডাকা যাক, তারপর বাড়ি ফিরে ওঝা ডাকতে হবে।

চুপ বুদ্ধু। ওঝার নাম করলে উনারা রেগে যান।

রেগে যান কেন ঠাকুর ?

ওঝারা ওষুধ দেয় যে। কিন্তু রুগী কি ওষুধ খেতে চায় ? তাই ডাক্তার এলেই রুগী রেগে যায়। আর যা তা বলিস নে। তাহলে তোর মুণ্ড চিবোবে। তার চেয়ে পালিয়ে আয়।

এরপর দুজনে আবার ক্যাপটেনের ঘরে হাজির। ক্যাপটেন শুধোয়, কি ব্যাপার ঠাকুর ?

আজ্ঞে ডেরাম ভূত।

ড্রাম ভূত ?

আজ্ঞে।

যত সব অপদার্থ, ভীতু।

আবার ক্যাপটেন সদলবলে এসে ঢোকে গুদাম ঘরে। গংগলু ড্রামটা দেখিয়ে দেয়। সকলে দেখে ড্রামের চারপাশে লেবুর খোসা। কে যেন এই একটু আগে লেবু ছাড়িয়ে খেয়েছে। এখনও লেবুর মিষ্টি সুবাসে ঘর ভরপূর।

ক্যাপটেনের কপালটা কুঁচকে যায় এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর মুখের ওপর মৃদু হাসির ঢেউ খেলে যায় একবার। সকলকে অবাক করে দিয়ে ক্যাপটেন এগিয়ে যায় ড্রামটার কাছে, তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে যাকে টেনে তোলে তাকে দেখে সকলে অবাক।

সকলেই একসঙ্গে বলে ওঠে, খোকনবাবু! ক্যাপটেন বলে, হ্যাঁ, ড্রাম ভূত। মনে হয় ঝড় থামার পর এঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর ড্রামের মধ্যে বসে বসে মনের সুখে লেবু খাচ্ছে।

খোকনবাবুকে দেখতে পেয়ে সকলের মুখেই হাসি ফুটে ওঠে। অনেকেই তাকে ঘিরে নাচতে সুরু করে। একজন তো মুখে মুখে একটা কবিতা বানিয়ে সুর করে গাইতে লাগল,

ট্রাম ভূত থাম ভূত,
আম ভূত জাম ভূত,
সেরা ভূত ড্রাম ভূত,
লেবু খায় ঘরে ;
কিল ভূত ঢিল ভূত,
লাঠি ভূত চাঁটি ভূত,
বড় ভূত চড় ভূত,
দেখে পড়ে সরে।

খোকনবাবু সব দেখে শুনে শেষে শুধু বলে, অবাক কাণ্ড!

বেশ কদিন একঘেয়ে জীবন যাপনের পর একটা আনন্দের খোরাক পেয়েছে সবাই। তাই খাওয়া-দাওয়া ভুলে প্রায় সকলেই আনন্দে মেতে উঠেছে। ২রা অক্টোবর থেকে মাটির মুখ কেউ দেখে নি। চারদিকে শুধু জল আর জল।

খাও, দাও, নাচ, বেড়াও সব এই জাহাজে। একঘেয়ে হয়ে উঠছিল জীবনটা আজ যেন তা থেকে মুক্তি।

কিন্তু এদের বরাত খারাপ। সুখ সইবে কেন? সবাই যখন নাচ-গানে মত্ত রঞ্জন তখন বাইরে ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে রাতের সাগরের সৌন্দর্যকে উপভোগ করছিল একা একা। অগাধ জলরাশি, অথচ চোখে দেখা যায় না। এ যেন প্লুটোর রাজত্ব। সাগরের বিক্ষোভ যেন মৃত আত্মাদের করুন কান্না। মেঘহীন আকাশে তারারা মিটিমিটি জ্বলছে, নীচে সাগরের জলেও তারাদের ঝিকিমিকি। অবশ্য সত্যিই সাগরে তারা নেই। এরা সাগরের জোনাকি। এদের নাম প্ল্যাংকটন। একরকম গাছ আর প্রাণীর সমষ্টি। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এই প্ল্যাংকটনের মধ্যে থাকে লাখ লাখ কোটি কোটি কাংড়া, চিংড়ি, জেলি মাছ ইত্যাদির শূক আর উদ্ভিদের কণা। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেউয়ের মাথায় ভাসে। রাতের বেলায় তাই ঢেউয়ের মাথায় তারা জলে। এইসব প্ল্যাংকটন মাছ, বড় বড় জীবের খাদ্য। তবে এদের শূক কম পড়ে না, কারণ এক একটা মাছ হাজার হাজায় ডিম পাড়ে। এক একটা ইলিশ-তো দশলাখেরও বেশী ডিম পাড়ে, আবার এমন শুক্তিও আছে যারা প্রায় দশ কোটি ডিম পাড়ে।

অবাক হয়ে দেখে রঞ্জন, আর ভাবে। হঠাৎ মনে হয়, প্ল্যাংকটনের ঝাঁক যখন দেখা গেছে তখন মাছ বা সামুদ্রিক জীবও কাছাকাছিই আছে। কারণ প্ল্যংকটন মাছেদের খাদ্য। আবার ঐসব মাছের লোভে বিভিন্নরকম সামুদ্রিক প্রাণীও এসে হাজির হতে পারে। জাহাজ নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপের কাছাকাছি এসেছে। প্ল্যাংকটনের রাজত্ব মহীসোপানে অর্থাৎ সাগরের তলায় মহাদেশের শেষ প্রান্তে মহাদেশ না হলেও বড় দ্বীপের সাগর-নিম্নস্থ শেষ অংশেও অনেক সময় প্ল্যাংক-টনের ঝাঁক দেখা যায়। ক্যাপটেনকে কথাটা জানাবার জন্যে রঞ্জন ভেতরে যায়।

রঞ্জনের মুখ থেকে সব শুনে ক্যাপটেন, শংকর সবাই বাইরে আসে। ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে প্ল্যাংকটনের ঝাঁকের দিকে চেয়ে তিনজনের মধ্যে ছোটখাটো কথাবার্ত্তা চলে।

ক্যাপটেন বলে, তোমার কথাই ঠিক, রঞ্জন। আর না এগিয়ে এইখানেই তিমিঙ্গিলের উদ্দেশে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

এখান থেকে চাওরা কতদূর হবে, ক্যাপটেন? বুঝতে পারছি না। তবে কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ আছে।

শংকর বলে, দ্বীপের খুব কাছে না থাকাই ভাল। এখানকার জংলী লোকেদের খপ্পরে পড়লে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।

রঞ্জন বলে, শুনেছি এখানে ভাল চুন পাওয়া যায়। এরা নাকি ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরী করে।

শংকর বলে, কিছুদিন আগেই আমি এইসব দ্বীপের অধিবাসীদের ওপর লেখা একটা বই পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে নানকৌড়ী আর বসপকায় চুন তৈরী হয়।

ক্যাপটেন বলে, বর্ত্তমান যুগেও যে এরকম অসভ্য জাতি থাকতে পারে এদের না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

শংকর বলে, এরজন্যে প্রকৃতিই দায়ী। সভ্য দেশ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। আবার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদের অনেক উপজাতিই আজ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। অবশ্য এর আর একটা কারণ দলাদলি আর হিংস্রতা। এদের ডেভিল মার্ডারের কথা শুনেছ রঞ্জন ?

ডেভিল-মার্ডার !

হ্যাঁ। সে এক হিংস্র প্রথা।

হঠাৎ শংকরের মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে যায়। চোখদুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে ওঠে।

রঞ্জন বলে, কি ব্যাপার শংকর ?

শংকর মুখে আঙুল দিয়ে কথা কইতে নিষেধ করে। তারপর হাত দিয়ে সাগরের একটা জায়গা দেখায়। ওরা সভয়ে দেখে একটা কালো ছায়া ট্রলার থেকে হাত দশেক দূর দিয়ে তীব্র বেগে সামনের অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল।

শঙ্কর বলে, গতিক ভাল নয়। ক্যাপটেন। ওটা কি জান ?

ক্যাপটেনের মুখেও তখন পড়েছে ভয়ের ছায়া। ফিসফিস করে বলে, মনে হচ্ছে একটা ক্যানো।

ঠিক ধরেছ ক্যাপটেন। এখানকার জারোয়া, ওঙ্গী এইসব আদিম হিংস্র জাতিরা ক্যানো ব্যবহার করে। ওরা যদি ভাবে আমরা ওদের খাদ্যে ভাগ বসাতে এসেছি তাহলে নিষ্কৃতি নেই। খুব সম্ভব ওরা বুঝতে পেরেছে।

দিনের আলো যতই ফুটে উঠতে লাগলো ক্যাপটেন আর শঙ্করের আশঙ্কাও ততই প্রকট হতে সুরু করল। দূরে সার সার নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীল আকাশের গায়ে সবুজ নারকেল গাছগুলোর ছোঁওয়া লাগছে। পায়ে নীল সমুদ্র।

ক্যাপটেনের আদেশে জাহাজ আর এগোয় না, বরং গভীর সমুদ্রের দিকে পিছিয়ে আসে।

ভোর হতে না হতেই যে যার কাজে লেগে যায়। উন্নি দু, একজন খালাসীর সাহায্যে সাগর থেকে মাছ ধরার জন্যে তৈরী হয়। অনেকদিন ভাল মাছ খাওয়া হয়নি কারও, তাই ক্যাপটেন উন্নিকে ঐ কাজে লাগায়। ওদিকে রঞ্জন তার ব্যাথিশেল যন্ত্রটাকে আর একবার পরীক্ষা করে দেখে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে। এই বারেই সত্যিকারের পরীক্ষা। হারপুন যন্ত্রটাকেও ঠিক করে রাখা হল। ক্যাপটেনের সঙ্কেত পেলেই ব্যবহার করা হবে। ক্যাপটেন আর শংকর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সাগরের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত যতটা দেখা যায় ততটার ওপরই সজাগ দৃষ্টি রাখল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে এল সন্ধ্যে। কিন্তু না তিমি, না তিমিঙ্গিল। তবু তিমিঙ্গিলের হঠাৎ আক্রমনের আশঙ্কা মন থেকে যায় না। এর ওপর সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে নারকেল গাছ ঘেরা দ্বীপটার দিক থেকে একটা ডিম ডিম রব ভেসে আসতে লাগল। শব্দ শুনে সকলের রক্ত জমে যাবার উপক্রম। রাত যতই বাড়তে লাগল, সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গধ্বনি ছাপিয়েও সেই হাড় হিম করা ডিম ডিম শব্দটা ভেসে এসে কাঁপিয়ে তোলে সকলকে।

ক্যাপটেন গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভাবছে শঙ্করও। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ক্যাপটেন বলে, শব্দটা খুব সম্ভব চাওরার দিক থেকে আসছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না, ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন শঙ্করের দিকে তাকায়। শঙ্কর বলে, খুব সম্ভব আমরা কার-নিকোবরের কাছে রয়েছি। জাহাজ পথ ভুল করেছে।

বাইরে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দুজনের কথাবার্তা চলছিল। শঙ্করের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'স্যাৎ' করে পর পর তিন তিনটে ছায়া চলে গেল ট্রলারের দশ হাত দূর দিয়ে।

গম্ভীর মুখে ক্যাপটেন বলে, যা ভাবছিলাম তাই। আগে মনে হয়েছিল কা—না—আন—হাউন উৎসবের জন্যেই নাচ গান হচ্ছে হয়তো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা নয়। ওরা আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে শঙ্কর।

আমিও তাই ভাবছি। গতকাল একটা, আজ তিন তিনটে ক্যানো ট্রলারের আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছে। আর ঐ ডিম ডিম শব্দ করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে শত্রু নিকটে। সাবধান।

বিরাট কাণ্ড! ডেভিল্ মার্ডার!

হঠাৎ খোকনবাবু কখন এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করেনি। শঙ্কর বলে, ও কথাটা তুমি জানলে কি করে?

ক্যাপটেন বলে, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ শঙ্কর। কথাটা তুমিই বলেছিলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বটে। কি নিষ্ঠুর প্রথা। ওরা যদি মনে করে কাউকে অপদেবতা ভর করেছে তাহলে সেই লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। চুরি বা ডাকাতির জন্যেও ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

কিরকম?

খোকনবাবু শঙ্করের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে পিটিয়ে। হাত, পা ভেঙে মেরে ফেলা হয়।

বিরাট কাণ্ড।

আর ঘুমই কি আসতে চায়। শাস্তির কথা শুনেই তার চোখ থেকে ঘুম উবে যায়। শাস্তিটা কি ধরনের তা সে জানে। হয়তো নিজের চোখেই দেখেছে সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড। তাই দণ্ডাদেশ শোনার পর থেকেই পালিয়ে তো বেড়াবেই, উপরন্তু চেষ্টা করবে কি করে জেগে থাকা যায়।

কেন, জেগে থাকতে চেষ্টা করে কেন?

কারণ ঘুমোলেই সেই ঘুম হবে অন্তিম ঘুম। জেগে থাকলে তার গায়ে কেউ হাত দেবে না। এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন যতই দিন যাবে, ততই ক্লান্ত হয়ে পড়বে সে, ঘুমের ভারে নেমে পড়বে চোখের পাতা। শেষে

ঢলে পড়বে ঘুমের কোলে। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কতকগুলো জোওয়ান অসভ্য উলঙ্গ অধিবাসী তার ওপর। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তার হাত, পা, মাথা সব গুড়িয়ে ফেলবে। তারপর দেহটাকে টেনে ফেলে দেবে সাগরের জলে।

ক্যাপটেন, ঐ যে একটা উৎসবের কথা বললে সেটা কিরকম?

খোকনবাবুর দিকে চেয়ে ক্যাপটেন বলে, কা—না—আন—হাউন উৎসব একটা বাৎসবিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয়। কেউ মবে যাবার এক বছর পরে ওরা এই উৎসবের আয়োজন করে। এই সময় ওরা নাচ, গান করে। এরা নিষ্ঠুব, তবে নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকতেই ভালবাসে। আমরা তো ওদের পাকাধানে মই দিইনি, আমাদের ডেভিল মার্ডার করবে কেন?

শঙ্কর বলে, ডেভিল মার্ডারের নাম শুনে তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ দেখছি। আমরা ওদেব পাকা ধানে মই দিইনি ঠিকই, তবে ওদের খাদ্যে ভাগ বসাতে পারি। এই জন্যই ওদের মাটিতে বিদেশীদের পা পড়লেই ওবা চরম দণ্ড দিয়ে থাকে।

ওরা কী খায়?

ওরা চাষ করতে জানে না। বনের ফলমূল আর সাগরের মাছ ওদের প্রধান উপজীবিকা। শূয়োরের মাংস ওদের প্রিয়। এইজন্যেই ওদের ভয় কেউ এলে ওদের খাদ্য কমে যাবে। চাষের আদব-কায়দা ওরা জানে না।

বিরাট কাণ্ড! আমাকে যদি ওরা ডেভিল মার্ডার না করে তাহলে আমি শিখিয়ে দোব।

ক্যাপটেন বলে, খোকনবাবু সে সুযোগ দেবে না, তার আগেই ডেভিল মার্ডার।

॥ ১৮ ॥

পরের দিন ট্রলার নিয়ে আরও গভীর সমুদ্রে টহল দিয়েও তিমিঙ্গিলের সন্ধান পাওয়া গেল না। রঞ্জন তো রেগে বলে ফেলল, আমরা একটা অবাস্তবের পিছু ছুটছি ক্যাপটেন। তিমিঙ্গিলের কোনো অস্তিত্বই নেই। ওটা একটা আজগুবী কাহিনী।

ক্যাপটেন অবশ্য রঞ্জনের কথাটাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারল না। বেশ খানিকটা চিন্তার পর বলল, দেখ রঞ্জন সাগরের ওপর আমি অনেকদিন কাটিয়েছি, তিমিঙ্গিল নামে কোনও জীবের অস্তিত্ব চোখে পড়েনি কখনও।

তাহলে তুমি কেন এই অভিযানে অংশগ্রহন করেছ? সেই কথাই আজ তোমাদের বলছি রঞ্জন। আজ থেকে কবছর আগে কাগজে একটা খবর বেরোয়। তোমাদের হয়তো মনে আছে।

এই সময় শঙ্কর কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ক্যাপটেন বলে, ছোট্ট একটা খবর, তবে বিশ্বাস করা শক্ত। আলেপ্পির জেলেরা পাহাড় প্রমাণ একটা ঢেউয়ের মাথায় দেখতে পায় একটা ফোয়ারা, আর সেই ঢেউয়ের পিঠে ছিল আমাদেরই মতো একটা মানুষ, সেকেণ্ডের মধ্যেই সাগরে মিলিয়ে যায় দৃশ্যটা। অনেকেই নাকি. দেখেছে সে দৃশ্য। আমার মনে হয় তিমি-ঙ্গিলের সঙ্গে সেই ঘটনার একটা যোগাযোগ আছে। কাগজে চাওরার খবরটা পড়ে আমার তো তাই মনে হচ্ছে। সেই সমুদ্র-মানবের খোঁজেই আমি এসেছি।

এই সময় উন্নি ছিল কাছাকাছি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে, আড়িপেতে প্রায় সব কথাই শোনে। ক্যাপটেনের মুখে কথাটা শুনেই ওর চোখদুটো জ্বলে ওঠে, কঠিন হয়ে ওঠে চোয়াল দুটো, শক্ত হয়ে ওঠে হাতের আঙুলগুলো, যেন তাকে পেলেই খুন করবে।

সেই জন্যেই আমি সকলকে বলছি জীবটার দেখা যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বন্দুক বা তীর ছুঁড়ে তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না। ওকে আমি জীবন্ত ধরতে চাই।

খোকনবাবুর চোখদুটো বড় বড় হয়ে ওঠে।

বিরাট কাণ্ড! আচ্ছা ক্যাপটেন ওটাকে মিউজিয়মে রাখা যায় না?

শঙ্কর বলে, তোমার যেমন বুদ্ধি। মিউজিয়মে কি জীবন্ত প্রাণী থাকে?

তাহলে কেরালার টেক্কাড়ির বনে ছেড়ে দেওয়া হবে। হাতী, হরিণ, বাঘেদের সঙ্গে তিমিঙ্গিল বেশ সুখেই থাকবে। বেশ মজা হবে তাই না? যেই না বাঘ 'ওংম্র' শব্দ করে তেড়ে আসবে, অমনি তিমিঙ্গিল গপ করে গিলে ফেলবে। তারপর পেটের ভেতর গিয়ে লাফা কত লাফাবি।

শঙ্কর বলে, মজা তো হবেই। অবশ্য জলের জীব যদি ডাঙায় বাঁচে তবেই॥

॥ ১৯ ॥

১১ই অক্টোবর। রাত দুটো। জাহাজের সকলেই গভীর ঘুমে অচেতন। জেগে আছে শুধু পৃথন। জাহাজে অবশ্য সকলে তাকে স্বরাইয়া বলেই জানে। উন্নির মতো সেও ক্যাপটেনকে ধরে একটা জায়গা করে নিয়েছে। উদ্দেশ্য তিরুনালের খোঁজ করা। মুখে একমুখ দাড়ি গোঁফ। হাত, পায়ের নখও বড় বড়। তিরুনালকে হারানোর পর থেকে পৃথন চুল, দাড়ি, গোঁফ, নখ কাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওকে দেখে পৃথন বলে চেনাই যায় না।

পৃথন সকলকে এড়িয়েই চলে। কারও সঙ্গে মেশে না, কথাও বড একটা কয় না। যা কিছু বলে নিজের সঙ্গেই। আপন মনে আবল তাবল বকে। তবে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সজাগ।

পৃথন ঘুমোয় কম, খায়ও কম। মাঝে মাঝে সাগরের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। কখনও দুচোখ বেয়ে পডে জল। সন্ধ্যের পর থেকেই পৃথনের দেখা মেলা ভার। ছাদের মাথায় উঠে সাগরের চারধারে তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, ঢেউ, ঢেউ আসছে।

আজকাল ওর কথায় কেউ আর কান দেয় না। সকলেই ভাবে স্বরাইয়া একটা পাগল।

রাত দুটো। বসে আছে পৃথন। চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে আপনমনে বিড় বিড় করে বকছে, আর চারধারে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুজছে। এক সময় তন্দ্রা এসেছে হঠাৎ দুলে ওঠে জাহাজটা। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয় পৃথন। কেটে যায় তন্দ্রাটা। বিস্ময়ে সামনের দিকে তাকাতেই ওর চোখদুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। অনন্দে অধীর হয়ে ছাদের মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার সুরু করে পৃথন, ঢেউ আসছে, ঢেউ।

পৃথনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ে জাহাজের একটু আগেই। দুলে ওঠে জাহাজটা বেশ জোরে। প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় সকলের। হুড়মুড় করে সকলে বেরিয়ে পড়ে কেবিন থেকে।

এদিকে ছাদের মাথায় আছড়ে পড়ে, পৃথন। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় আবার, তারপর সুরু করে চিৎকার, ঢেউ আসছে, ঢেউ। তোমরা এস, ঢেউ আসছে।

ক্যাপটেনের আদেশে জাহাজের সবকটা আলো জেলে দেওয়া হল। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল জাহাজের চারপাশ। কিন্তু কারও চোখে কিছু পড়ল না।

ক্যাপটেন, শঙ্কর আর রঞ্জনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কি সব কথা বলে, তারপর ক্যাপটেন আর রঞ্জন দ্রুত কজন খালাসীকে নিয়ে ভেতরে যায়। একটু পরেই সবাই মিলে ব্যাথিশেল যন্ত্রটাকে ধরাধরি করে বাইরে আনে। তৈরী হয়ে নিয়েছে, রঞ্জন। এবার চরম পরীক্ষা। সকলের বুকেই পড়ছে হাতুড়ির ঘা। মন বলছে, তিমিঙ্গিল। তিমিঙ্গিল।

ঠিক এই সময় বিকট এক চিৎকার করে সাগরে ঝাঁপ দেয় পৃথন। চিৎকার করে ওঠে সবাই, গেল, গেল, সুরাইয়া ডুবে গেল।

তৈরী হয়ে নেয় একজন ডুবুরী ক্যাপটেনের আদেশে। বুকে ইলেকট্রিক ল্যাম্প, পেছনে অক্সিজেনের বাক্স। পিঠে কষে দড়ি বাঁধা। সাগরে ঝাঁপ দেয় ডুবুরী।

এদিকে রঞ্জনও তৈরী। ব্যাথিশেলের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে।

সাগরে নামিয়ে দেওয়া হল রঞ্জনকে।

রঞ্জন নামার পরক্ষণেই যে ডুবুরীকে সাগরে নামানো হয়েছিল তার দড়িটা নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দড়ি ধরে টানতে আরম্ভ করে। একটু পরেই শঙ্কর চিৎকার করে ওঠে, সুরাইয়া, ঐ যে সুরাইয়া। ধর ধর। ওদের টেনে তোল।

কে একজন বলে, বেচারা বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছে।

জাহাজে তুলে বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করার পর পৃথনের জ্ঞান ফিরে আসে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে সকলের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ক্ষীণ স্বরে বলে, সে কোথায়?

শঙ্কর পৃথনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে শুধোয়, কার কথা বলছ, সুরাইয়া? তিমিঙ্গিল?

পৃথন মৃদুস্বরে বলে, ঢেউটা কোথায় গেল? এরপর ঝিমিয়ে পড়ে সে।

ক্যাপটেনের নির্দেশে পৃথনকে তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর হারপুন যন্ত্রটাকে ফাঁকা জায়গায় আনা হল। সেটাকে ঠিক করে রাখে দুজন। তবে ক্যাপটেনের কড়া হুকুম, তার নির্দেশ না পেলে কেউ যেন জীবটাকে আঘাত না করে, অবশ্য সত্যি সত্যিই যদি তিমিঙ্গিলের মতো কোনও জীবকে দেখা যায়।

উন্নি ছাড়া দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সকলের সময় কাটে। চুপি চুপি উন্নি পালিয়ে আসে ওদের কাছ থেকে দূরে। চারপাশ ভাল করে দেখে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। বিছানার তলা থেকে বের করে আনে একটা বন্দুক। সেটাকে দুমড়ে গুলি ভরে। এরপর দরজা খুলে চুপি চুপি বাইরে আসে, তারপর সকলের অলক্ষ্যে জাহাজের অন্যপাশে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাগিয়ে ধরে হাতের বন্দুকটা।

জ্বলছে ওর চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করে। তিরুনালকে হাতের কাছে পেলে ও হয়তো ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে। সাগরের জলে তাকিয়ে আছে উন্নি আর ভাবছে শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেলে কিভাবে গুলি করবে। ওর স্থির বিশ্বাস ঐ তিমিঙ্গিলকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে তিরুনাল। হঠাৎ সুরাইয়ার মুখটা ভেসে ওঠে উন্নির মনে। কে সুরাইয়া? দিনরাত সাগরের দিকে তাকিয়ে কাকে খোঁজে লোকটা? রাতের বেলায় জেগে জেগে কি করে? একটু আগে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন? তবে কি পৃথন মরে নি?

ভয়ে কেঁপে ওঠে উন্নির বুকটা। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে পৃথন ছেলে-মেয়ের শোকে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।

আবার ভাবে, তাই বা কি করে হয়? পৃথন যে মরে গেছে এ খবর সে এখনও পায় নি। ঢেউ দেখে সুরাইয়া ওরকম অস্থির হয়েই বা পড়ে কেন? তাহলে সুরাইয়াই কি পৃথন? ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

বন্দুকটা দুহাতে চেপে ধরে উন্নি। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। হাতের আর কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে; দপ দপ করে ওগুলো উত্তেজনায়।

বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে, ধীরে ধীরে নিজেকে লুকিয়ে সুরাইয়ার ঘরের দিকে এগোয় উন্নি। দুচোখে ওর জিঘাংসা।

॥ ২০ ॥

ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে রঞ্জন। সার্চলাইটের তীক্ষ্ণআলোয় সামনের সবকিছু পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে। এ এক নতুন জগৎ, নতুন অনুভূতি। এখানে হৈ হট্টগোল নেই, চিৎকার চেঁচামেচি নেই। সর্বত্র এক অখণ্ড নীরবতা, নিস্তব্ধতা।

নীচের নামছে রঞ্জন। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক নল বা টিউব-মুখো মাছ

ছুটে পালাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। এক সময় একটা সাদা-হাঙ্গর ছুটে এল ব্যাথিশেলের কাছে, ওর গায়ে মুখ রেখে ঘুরতে লাগলো চারপাশ। পরীক্ষা করে দেখে ও'টা খাবার জিনিস কিনা। সার্চলাইটটা একবার নিভিয়ে দেয় রঞ্জন। পরক্ষণেই সুইচ অন করতেই ওর সুতীক্ষ্ণ, তীব্র আলোটা আচমকা ছুটে যায় সামনের দিকে। পালিয়ে যায় ক্ষুদে রাক্ষসটা। এরপরেই রে-মাছের একটা ছোট পরিবার চ্যাপটা দেহ আর লম্বা সরু লেজ নিয়ে হাজির হল সামনে। অবাক চোখে একবার ব্যাথিশেল যন্ত্রটার দিকে চেয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। বস্তুটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

বেশ মজা পেল রঞ্জন যখন একটা মাঝরি আকারের করাত মাছ তার ইয়া লম্বা, করাতের মত দাড়াবিশিষ্ট নাক নিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে তেড়ে এল ব্যাথিশেলের দিকে। বাছাধন সজোরে একবার ব্যাথিশেলের গায়ে ঢুঁ মেরেই তীর বেগে অন্যদিকে ছুটে পালাল। তার ঐ অবস্থা দেখে একটা আধ-ঠুঁটো মাছ যার নীচের ঠোঁটটা বকের চেয়েও লম্বা, আর না এগিয়ে ছুট মারল পিছুদিকে। এই সময় রঞ্জনের ব্যাথিশেল যন্ত্রটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারল যন্ত্রটা মাটি স্পর্শ করেছে।

চতুর্দিকে আগাছা আর শেওলা। বিভিন্ন ধরণের ঝিনুক আর শামুক আগাছার গায়ে লেপটে আছে। বিচিত্র ধরনের বিচিত্র রংয়ের মাছগুলো চুপচাপ, আলস্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। সার্চ-লাইটের ছটায় তাদের মধ্যে যেন প্রাণের জোয়ার এল, ফূর্তির বন্যা বইতে লাগল। খাদ্যের সন্ধানে ওরা ছুটোছুটি সুরু করে দু'একটা ঠাণ্ডা সাগরের মাছ বা জীবও এসে অতিথি হয়েছে। তবে দেখে মনে হয় বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই পরিবেশে বা উষ্ণ স্রোতে খাপ খাওয়াতে পারছে না, হয়তো যেমন একটা ঈল মাছের ঝাঁক রঞ্জনের চোখে পড়ল। ছোট বড় মিলিয়ে গোটা দশেক হবে। পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে। ঠিক সাপের মতো হিল হিল করতে করতে এদিক ওদিক ছুটছে খাবারের সন্ধানে। ওদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করে রঞ্জনের কারণ ও শুনেছে বৈদ্যুতিক ঈল হলে শক্ দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর, হাত বের করতে পারে না।

এই সময় রঞ্জনের খেয়াল হল ব্যাথিলেশটা একটু একটু ক'র সামনের দিকে এগোচ্ছে। প্রথমটায় অবাক হলেও পরে বুঝল তার নির্দেশমত জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছে।

একটু একটু করে অজানা রাজ্যের কত জানা-অজানা সামুদ্রিক গাছ, মাছ, জীবেদের মধ্যে দিয়ে ওর ব্যাথিশেল এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ ওকি! বিস্ময়ে রঞ্জনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। ঐ যে খাড়া হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে! চীনের ড্রাগন?

॥ ২১ ॥

তুমি যাই বল না কেন শঙ্কর তিমিঙ্গিল বলে কিছু নেই, ওটা তিমিই। আর তাই যদি হয় তাহলে বড় জোর জীবটা কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট জলের তলায় ডুবে থাকতে পারবে, তারপর দম ছাড়তে ওপরে উঠে আসবেই।

বুঝব কেমন করে?

ঐ যে ফোয়ারা। ওদের মাথায় একটা ফুটো থাকে। জলের তলায় থাকতে থাকতে ওরা যখন দম ছাড়ে তখন ফোয়ারার মতো জল উঠতে আরম্ভ করে।

তাহলে শুধুমাত্র রঞ্জনের ওপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে না। দূরবীন দিয়ে চারপাশ দেখতে হবে।

এই সময় পৃথনের ঘরের দিক থেকে একটা ভারী জিনিস পতনের আওয়াজ আসে। অবাক চোখে শঙ্কর একবার ক্যাপটেনের দিকে তাকায়, তারপর সন্দিগ্ধ চিত্তে পৃথনের ঘরের দিকে যাবে বলে সবে পা বাড়িয়েছে এমন সময় সাগরের তলা থেকে রঞ্জনের ফোন আসে। থেমে যায় শঙ্কর। ফোন ধরে ক্যাপটেন।

....হ্যালো রঞ্জন.. কি হল? অদ্ভুত জীব? . চীনের ড্রাগনের মতো? .. কি হল? রঞ্জন? রঞ্জন? কথা বলছ না কেন?

অস্থির হয়ে পড়ে ক্যাপটেন। ফোনটা নীরব কেন? রঞ্জন কথা বলছে না কেন? তাহলে কি আর কোনাদিন রঞ্জনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে না?

॥ ২২ ॥

ধীরে ধীরে, অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে পৃথনের ঘরের দিকে এগোয় উদ্রি। হাতে বন্দুক। তাকে জানতেই হবে কে সুরাইয়া, কোথায় তার বাড়ি, কি

তার পরিচয়। সুরাইয়া যদি পৃথন না হয় তাহলে ভালই, আর যদি সে পৃথন হয় তাহলে বন্দুক তো আছেই। একটা গুলি, তারপর সব শেষ।

অন্ধকার আকাশটার দিকে তাকায় উন্নি। ভাবে রাত শেষ হতে আর দেরী নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে হবে। সবাই এখন তিমিঙ্গিলের খোঁজে ব্যস্ত। এই সুবর্ণ সুযোগ।

পৃথনের ঘরের সামনে এসে উন্নি একবার থমকে দাঁড়ায়। চারপাশে তাকিয়ে দেখে নেয় কেউ আছে কিনা বা লুকিয়ে তার কার্যকলাপ দেখছে কি না। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ে না। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে উন্নি, তারপর বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

ঘুমাচ্ছে পৃথন। কতদিন ভলে করে ঘুমোয় নি সে। রাতের পর রাত সাগরের দিকে চেয়ে দিন কেটেছে ওর। আজ ঘুমের কাছে হেরে গেছে পৃথন।

এগিয়ে যায় উন্নি। ওর দুচোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। বন্দুকটাকে দৃঢ়ভাবে ধরে এগিয়ে যায় পৃথনের দিকে। পৃথনের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে উন্নি। ওর হিংস্র দৃষ্টিটা পৃথনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক ঘোরাফেরা করে তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ায় মুখের ওপর। কিন্তু ঘরের ক্ষীণ আলোয় মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে উন্নি। একটা কাঠি জ্বালে। ডান হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে, কোমর বেঁকিয়ে, মুখ নীচু করে, পৃথনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উন্নি। মুখে একমুখ দাড়ি, গোঁফ, মাথায় বড় বড় চুল, রংটা তামাটে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে উন্নি পৃথনের মুখের দিকে। চোখদুটো বড় বড় হয়ে ওঠে উন্নির, একটা অজানা ভয় যেন উন্নির রক্ত জমিয়ে দিতে চায়। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক। শুধু মুখটা দাড়ি-গোঁফে, ভর্তি, আর রংটা তামাটে। এ তার চিরশত্রু বৈমাত্রেয় ভাই পৃথন। উন্নির সমস্ত শরীরে কাঁপুনী ধরে যায়। মুহূর্তের অসাবধানতায় হাতের বন্দুকটা নীচেয় পড়ে যেতেই একটা জোর শব্দ হয়।

ফুঁ দিয়ে উন্নি কাঠিটাকে নিভিয়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে একবার দেখে আসে বাইরেটা, তারপর তুলে নেয় বন্দুকটা। পৃথনের বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে বন্দুকটা। উন্নি এখন বাঘের চেয়েও হিংস্র। ওর থাবা পৃথনের রক্তে লাল না হয়ে উঠলে উন্নির মনে শান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই।

বন্দুকের ঘোড়ায় হাত দেয় উন্নি। তারপর আঙুলের চাপ দিতে গিয়েই থেমে যায় সে। একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল সে। এখনি বন্দুকের শব্দ শুনে ছুটে আসত সকলে তারপর ছিঁড়ে ফেলত উন্নিকে। বন্দুকটা নামিয়ে রাখে উন্নি। তারপর কোমর থেকে বের করে একটা বড় ছুরি। বাঁটের কাছে চাপ দিতেই 'ক্লিক' করে একটা শব্দ তুলে খুলে যায় ছুরির পাতটা। বিজলী বাতির ক্ষীণ আলোর মধ্যেও চক্ চক্ করে ওঠে ছুরির পাতটা।

হাতের মুঠোয় সজোরে চেপে ধরে উন্নি ছুরির বাঁটটাকে। শূন্যে উঠে যায় ওর ডান হাতটা। একবার ঝিলিক তুলেই ইস্পাতের পাতটা তীব্রগতিতে নেমে আসে, কিন্তু থেমে যায় মাঝপথে।

বাইরে প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল। কান খাড়া করে শোনে উন্নি। একটা অর্থহীন চিৎকার কানে আসে শুধু। ভাবে, তাহলে কি ধরা পড়েছে জীবটা? আর তিরুনাল? নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া গেছে। উন্নির সব আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তিরুনালকে পাওয়া যায়।ওর মন বলছে সে বেঁচে আছে। তাই তাকে নিজের হাতে খুন করবার জন্যেই এতদূরে এসেছে উন্নি। ছুরিটাকে কোমরে লুকিয়ে, বন্দুকটাকে হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় উন্নি ঘরের বাইরে।

॥ ২৩ ॥

ক্যাপটেনের মতো রঞ্জনও অবাক হয়ে যায়। হাজারবার ডেকেও আর ক্যাপটেনের গলার স্বর শোনা যায় না। এদিকে সামনে সেই অদ্ভুত জীবগুলো। মুখটা ঘোড়ার মতো। ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ। পিঠ থেকে ভ্রূ পর্যন্ত বড় বড় কাঁটার মত শুঁয়োয় ভরা। লেজটা ঠিক কুমীরের মতো। রঞ্জন অনেক সামুদ্রিক জীবের নাম শুনেছে বা ছবিও দেখেছে কিন্তু ঠিক এই ধরণের জীবের নাম শুনেছে কিনা বা কখনও ছবিতে দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না।

ভাবছে রঞ্জন, অবাক হয়ে ভাবছে শুধু। হঠাৎ বেজে ওঠে ফোনটা।

হ্যালো—ক্যাপটেন? ··কি হয়েছিল?·· যান্ত্রিক গোলযোগ?·· ভগবানকে ধন্যবাদ · ড্রাগন ···সামনেই রয়েছে। মুখটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মতো। লেজ দিয়ে গাছ জড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। লম্বায় এক ফুটের মতো···কি বললে?···সী হর্স?···না ভয়ের কিছু নেই।

সকাল হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে। রঞ্জনের ব্যাথিশেল থেকে সার্চলাইটের তীব্র ফোকাস অজানা, অন্ধকার রাজত্বের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কত বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র রংয়ের সামুদ্রিক গাছ গাছড়ার এক অদ্ভুত জগৎ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কী সুন্দর সুন্দর রঙীন মাছেদের ভিড় সেখানে। তাদের অনেকেরই নাম রঞ্জনের জানা। মাঝে মাঝে দু, একটা দেবদূত মাছ সোনালি পাখনা নাড়িয়ে চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। কোথাও স্পঞ্জের ভিড়, আর তারই এধারে ওধারে সুন্দর সুন্দর রং বেরংয়ের ডানা খেলিয়ে ঘুরছে ফিরছে কতকগুলো প্রজাপতি মাছ। দু, এক জায়গায় নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে গোটাকতক তারা মাছ। মাঝে মাঝে দু, একটা গোট-ফিশও দেখতে পায় রঞ্জন। ছাগলের মতো দাড়ি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ব্যাথিশেল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সার্চলাইটের তীব্র ফোকাসটা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আলোটা। সামনেই দেওয়ালের মত কী যেন রয়েছে। রঞ্জন ভাবে হয়তো ওটা একটা ডুবো পাহাড়ের দেহ। কিন্তু নড়ে ওঠে পাহাড়টা। সার্চলাইটের আলোয় এক অকল্পনীয় দৃশ্য রঞ্জনের চোখে পড়ে। একটা মানুষ। দেহটা শেওলায় ঢাকা। বিরাটকায় এক জীবের বুকের দুধ খাচ্ছে।

অবাক হয়ে যায় রঞ্জন। সে স্বপ্ন দেখছে নাতো ? এ কি সত্যি ? সাগরের নীচে মানুষ ! আর ঐ অদ্ভুত দৈত্যের মতো জানোয়ারটা ! ওর মুখের ওপর আলো পড়তেই ভয়ে রঞ্জনের গা শিউরে ওঠে। শয়তানের মতো এক বীভৎস মুখ। মুখ বন্ধ তবু অসংখ্য ঝাঁঝরার মতো লম্বা দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী। ভয়ে রঞ্জনের রক্ত জমে আসার উপক্রম। ওটা যে একটা বৃহদাকার তিমি এটা ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ঐ সমুদ্র-মানব ? দেখতে অনেকটা বনমানুষের মতো। তিমির বাচ্ছা ? তাই বা কি করে হবে ? ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায় রঞ্জন।

রঞ্জনের ভাগ্য ভাল তিমিটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে না। ওর ব্যাথিশেলকে হয়তো তারই মতো একটা জীব ভেবেছে। কিন্তু গলার ফুটো ছোট। ওর ভেতর দিয়ে ব্যাথিশেলটা ঢুকবে কেন ? সেইজন্যেই বোধ হয় এদিকে লক্ষ্য নেই। রঞ্জনেরও অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল রঞ্জন অতিকায় তিমিটার দিকে। ক্যাপটেনকেও রিলে করছিল

সবকিছু। হঠাৎ সার্চলাইটের আলোর পর্দায় ভেসে উঠলো এক ভীষণ, ভয়ঙ্কর, কুচকুচে কালো সাপের দেহ। গায়ে অসংখ্য গর্ত। এরপর আর একটা সাপ, তারপর আর একটা। এবারে ভয়ে শিউরে ওঠে রঞ্জন। ওগুলো সাপ নয়. তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ঐ তো ঢিবির মতো মাথা। একপাশে ড্যাব্ ড্যাব্ করছে দুটো চোখ। মাকড়সার মতো আটটা শুঁড়। শুঁড়গুলোর নীচে অনেকগুলো চোষক অক্টোপাস।

সাপের মতো হিল হিল করতে করতে জলদস্যুটার শুঁড়গুলো শিকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। পরম নিশ্চিন্তে সাগরের মানুষটা তিমির বুকের দুধ খাচ্ছে। ও বুঝতেই পারছে না যে ওর পিছু দিক থেকে আটটা শুঁড় বাগিয়ে এগিয়ে আসছে ওর যম।

॥ ২৪ ॥

সাবধান। সাবধান সব। তৈরী হয়ে নাও সবাই। গংগলু ট্রলটাকে ঠিক করে রাখ। শঙ্কর, তুমি একটা বন্দুক নিয়ে তৈরী থাক। এখনই দম ছাড়তে উঠে আসবে তিমিটা। ওটাকে ট্রলে করে আটকাতে হবে।

ক্যাপটেনের কথায় অবাক হয়ে যায় খোকনবাবু। স্টল! টী-স্টলের কথা বলছ ক্যাপটেন?

স্টল নয়, ট্রল। গভীর সাগরে মাছ ধরার জাল।

ট্রল ছিঁড়ে পালালে হারপুন গান ছুঁড়ে তিমিটার গায়ে বল্লম বিঁধতে হবে। তবে সাবধান আমি যতক্ষণ না বলছি কেউ বন্দুক ছুঁড়বে না। আমি চাই অক্ষত অবস্থায় সাগরের মানুষটাকে বন্দী করতে। এরপর সকলের সামনে ওকে আমি তুলে ধরতে চাই। ও হবে পৃথিবীর আর এক আশ্চর্য্য।

ক্যাপটেনের কথাগুলো উন্নিও শুনছে আর দাঁতে দাঁত ঘষছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার ওপর চলে যাচ্ছে আঙুলটা ওর কানদুটো ক্যাপটেনের দিকে; চোখদুটো ভেসে বেড়াচ্ছে সগেরের ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। হাতের আঙুল মাঝে মাঝে স্পর্শ করছে বন্দুকের ঘোড়া; মনটা সাগরের নীচে, সমুদ্র মানবের কাছে।

উন্নি বুঝতে পেরেছে। তরুনাল মরেনি। ঐ তিমিটাই ওকে আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচিয়েছে। মানুষ করে তুলেছে তার পরম শত্রুকে। মনে মনে

ভাবে, কি ভুলই না সেদিন করেছিল সে। কেন দুহাত দিয়ে সাঁড়াশীর মতো ওর গলাটা টিপে ধরেনি।

ট্রলটার একপ্রান্ত ধরে সাগরের দিকে চেয়ে আছে পৃথন। ঘুম ভাঙার পর গত রাতের সব কিছু মনে পড়তেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল পৃথন। একবার জলে ঝাঁপ দিতে যায়, কিন্তু ধরে ফেলে খালাসীরা। ক্যাপটেনের নির্দেশে ওকে ঘরে পুরে রাখা হচ্ছিল, শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ছাড়া পায়। জালেব একপ্রান্ত ধরে আছে পৃথন। দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

॥ ২৫ ॥

কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না রঞ্জন, অথচ ও বুঝতে পারছে একটা কিছু করা দরকার। তা নইলে মানুষের মতো ঐ জীবটাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারা যাবে না অক্টোপাসের হাত থেকে। আটটা শুঁড় সাপের মতো হিল হিল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র মানবের দিকে একটু একটু করে। কি বিশ্রী আর কদাকার জীবটা। সাক্ষাৎ যম। অন্ধকারে ওর দুটো ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ যেন জ্বলছে। কি বীভৎস! কি ভয়ঙ্কর।

একমনে তিমির বুকের দুধ খাচ্ছে মানুষের মতো জীবটা। রঞ্জন ওর নাম দেয় সমুদ্রমানব। তিমিটা চিরুণী দাঁত বের করে জল গিলছে মাঝে মাঝে। ধীরে ধীরে, সাবধানে, গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে অক্টোপাসটা। দুজনার মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমশঃই কমে আসছে। হাত তিনেক দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অক্টোপাসটা। হিংস্র বাঘের মতো শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী করে নিজেকে। একটা শুঁড় সাপের মত হিল হিল করতে করতে একবার সমুদ্রমানবের দেহটা স্পর্শ করে, তারপর এগিয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরে কোমরটা, টানতে আরম্ভ করে নিজের দিকে।

প্রথমটায় অবাক হয়ে যায় সমুদ্রমানব, তারপর বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসটার মুখোমুখি হয়, দুহাত দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করে শুঁড়টাকে। রণকৌশল অদ্ভুত, কিন্তু অক্টোপাসটা একটা একটা করে আটটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে মানুষটাকে। অক্টোপাস আর সমুদ্র মানবের মধ্যে এবারে সুরু হয় দারুণ লড়াই।

এতক্ষণে তিমিটাও বুঝতে পারে সব কিছু। অক্টোপাসটার দিকে একবার তাকায় সে। মনে হয় চিনতে পেরেছে জীবটাকে। সাগরে ওরকম জীবের সঙ্গে ওর বোধহয় প্রায়ই দেখা হয়। লড়াইও যে হয় না তা নয়। তবে তার কাছে ওরা তুচ্ছ। মজা দেখছে তিমিটা। তার পালক পুত্রের ক্ষমতার পরিমাপ করছে। সমুদ্র মানব যে তিমিটার নিজের সন্তান নয় এটা বুঝতে পেরেছে রঞ্জন। তিমিটা হঠাৎ যেন খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ে। মনে হয় বাতাস নেবার সময় হয়ে এসেছে। বেশী দেরী করলে তার ছেলেটার সঙ্গে সেও মারা পড়বে। তাই অযথা দেরী না করে অক্টোপাসটার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে এগিয়ে যায়। তিমিটা অক্টোপাসকে আঘাত করার আগেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি মাথা হাঙর ছুটে এসে দারুণ জোরে ঢুঁ মারে তিমিটার গায়ে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে সেকেণ্ডের মধ্যে এক বিরাট 'হাঁ' করে আবার ছুটে যায় তিমিটার দিকে।

ওদিকে আটটা শুঁড় দিয়ে অক্টোপাসটা চেপে ধরেছে সমুদ্র মানবকে। আর সমুদ্র মানবও প্রাণপণে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর শুঁড়গুলোকে দেহ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে দিয়ে পিছলে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যায় না ধাত্রীমায়ের কাছে। ওর কাছে পরাজয় মানেই মৃত্যু। তাই আবার বীরবিক্রমে বিপরীত দিক থেকে ছুটে যায় অক্টোপাসটার কাছে। কোনোরকমে মাথায় বা গায়ে আঘাত করতে পারলেই কাবু করা যাবে রাক্ষসটাকে এটা ঐ মানুষটা খুব সম্ভব ভালভাবেই জানে। রাক্ষসটাও সজাগ আর সতর্ক। সেও ঘুরে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে, তারপর সাপের মতো শুঁড়গুলো দিয়ে পিষে মারতে চেষ্টা করে ওর শিকারকে।

অবাক হয়ে দেখছে রঞ্জন। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে নিত। তাছাড়া মনের মধ্যে ওর এখন অন্য চিন্তা। যে করেই হোক সমুদ্র মানবকে বাঁচাতে হবে। কাগজের খবর অনুযায়ী ও যদি মানুষই হয় ওকে আবার মানুষের সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন তিমিটা যদি হাতুড়ি মাথা হাঙরটাকে হারিয়ে এখনই ফিরতে পারে তাহলেই রক্ষে। কিন্তু ওদের দিকে তাকাতেই রঞ্জনের চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। প্রচণ্ড লড়াই চলেছে দুজনের মধ্যে।

সাগরের জল তোলপাড়। কখনও তিমিটা লেজ দিয়ে ঝাপটা মারছে হাতুড়ি-মাথাকে, পরক্ষণেই হাঙরটাও দ্বিগুণ জোরে এসে ঢুঁ মারে তিমিটাকে।

রেগে যায় তিমিটা। হাঙরটাকে আবার ঝাপটা মারে। এ যেন ভীম আর ঘটোৎকচের যুদ্ধ। কেউ কম যায় না কিছুতে।

দম ফুরিয়ে আসছে সমুদ্র-মানবের। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। শ্বাস নেবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। এর ওপর অক্টোপাসটাও সজোরে চেপে ধরেছে ওর দেহটা। সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র-মানব।

হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যায় সেকেণ্ডের মধ্যে। তিমির লেজের ঝাপটায় হাতুড়ি-মাথা আছড়ে এসে পড়ে অক্টোপাসের ওপর। অক্টোপাসটা সমুদ্র মানবকে ছেড়ে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে হাতুড়ি মাথাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে শত্রু প্রবল শক্তিশালী। সঙ্গে সঙ্গে অক্টোপাসটা দেহ থেকে কালির মত রস ছিটোতে সুরু করে। দেখে মনে হয় একটা ঘন কালো মেঘ ছুটে এসে চারদিক ঢেকে ফেলল। এই সুযোগে হাতুড়ি-মাথা হাঙরটাও পালিয়ে যায়। হতভম্ব সমুদ্র মানব। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়ে সে। ধাত্রী-মা'র কথা মনে পড়ে। ছুটে যায় তিমিটার দিকে। তিমিটাও ওরই খোঁজে আসছিল। ছেলেকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী। বার বার ওর গায়ে মুখ ঘষে আদর জানায়। পালক-পুত্রকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে ওর আদরের মাত্রাটা যেন বেড়ে যায়। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়ে ওরা। সমুদ্র-মানব তিমির পিঠে উঠে পড়ে। রঞ্জন বুঝতে পারে ওরা এবার দম ছাড়তে ওপরে উঠবে। রঞ্জন ক্যাপটেনকে সব জানায়। ধীরে ধীরে রঞ্জনের ব্যাথিশেলটা এবারে ওপরে উঠতে সুরু করে।

॥ ২৬ ॥

এদিকে ডেকের ওপর হৈ হৈ কাণ্ড। ক্যাপটেন আর শঙ্কর ফোন পাবার পরই রীতিমত চিৎকার সুরু করে দেয়। ক্যাপটেন ঘন ঘন পায়চারি করে আর সকলকে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়।

ট্রল নিয়ে, কেউ বা হারপুন, কেউ তীর ধনুক অথবা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকে। তবে ক্যাপটেনের কড়া নির্দেশ একমাত্র আত্মরক্ষার্থেই যেন গুলি ছোঁড়া হয়। অকারণে গুলি ছুঁড়ে তিমিটাকে যেন খেপিয়ে না দেওয়া হয়। আর সমুদ্র-মানবের গায়ে কেউ যেন ভুলেও আঘাত না করে। ওকে জীবন্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ও সাগরের বিস্ময়। ও মাটির বিস্ময়।

উম্নিও প্রস্তুত। তার চরম শত্রুকে সে যেভাবেই হোক নিপাত করবে। ক্যাপটেনের নির্দেশকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না সে। ঐ চশমা-চোখে লোকটাকে দেখলেই উম্নির গা, হাত, পা, জলে যায়। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে মনে মনে এইসব ভাবে উম্নি। কখনও ভাবে বেগতিক দেখলে অন্য পথ ধরবে। কদিন রাতের অন্ধকারে উম্নি লক্ষ্য করেছে কালো ছায়ার মতো খানকয়েক ক্যানো ঘুর ঘুর করছে জাহাজের চারপাশে। একদিন সাহসে ভর করে ও বেশ কিছু বিস্কুট ছুঁড়ে দিয়ে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ক্যানোগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল আবার।

ওপরে উঠে আসে রঞ্জন, কিন্তু তখনও তিমিটার দেখা নেই। সকলেই কাণ্ড দেখে অবাক। রঞ্জনও চিন্তিত হয়ে পড়ে। উঠে আসার সময় সাগরের মধ্যেই তিমিটা হারিয়ে গিয়েছিল ঠিকই তা সত্ত্বেও রঞ্জনের দৃঢ় বিশ্বাস বাতাস নিতে তিমিটা এখনই আর এইখানেই কোথাও না কোথাও উঠবে। ভাবছে রঞ্জন আর চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। এই সময় পৃথন চিৎকার করে ওঠে, ঢেউ আসছে, ঢেউ। ছেড়ে দাও আমায়। আমি যাব।

পৃথনের চিৎকার শুনে সকলেই ভাল করে তাকায় সাগরের দিকে। সত্যিই একটা বিরাট ঢেউ সাগর ফুঁড়ে ওপরে উঠছে। ফুটো দিয়ে দম ছেড়েছে তিমিটা। ফোয়ারার মতো জল উঠছে। দেখতে দেখতে ফুলে উঠে সাগরের বুক। এরপর তিমির লেজের কিছুটা সকলের চোখে পড়ে, তারপর মুখ আর পিঠ। সবিস্ময়ে সকলে দেখে তিমির পিঠের ওপর বনমানুষের মতো একটা লোমশ প্রাণী শুয়ে রয়েছে। দেখতে প্রায় মানুষেরই মতো। অবাক হয়ে সকলেই সেদিকে চেয়ে থাকে। জীবটার সব কিছু আছে, নাক, চোখ, মুখ, কান সব। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে ক্যাপটেন, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল পাইলট। জাহাজটাকে তিমিটার কাছে নিয়ে চল।

এগিয়ে চলে জাহাজটা। ভয় আর বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে সকলে। যারা ট্রল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারাও ভয়ে কাঠ। ক্যাপটেন ভালভাবেই জানে ট্রলে তিমি ধরা যাবে না, তবে ঐ মানুষের মতো অদ্ভুত জীবটাকে ধরা যেতে পারে। তিমিঙ্গিলের অস্তিত্বে ক্যাপটেন মোটেই বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কাগজের সেই খবরটাকেও ভোলেনি ক্যাপটেন, সী-ম্যান, অন্ সী। সাগরের ওপর সমুদ্র মানব। কতদিন ক্যাপটেন ভেবেছে, এও কি সম্ভব। জলের তলায়

মানুষ কতদিন থাকতে পারে। বাতাসের অভাবে মরতে তাকে হবেই। আবার ভেবেছে, হয়তো বাঁচতে পারে। স্তন্যপায়ী তিমির দুধ খেয়ে, তার আশ্রয়ে হয়তো বড় হয়ে উঠছে একটা মানব-শিশু। তিমিটার সঙ্গে বাতাস নিতে সেও ওপরে ওঠে। আর ঐ কুড়ি মিনিট জলের তলায় থাকা হয়তো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাত-পাঁচ ভাবছে ক্যাপটেন, হঠাৎ কেঁপে ওঠে সকলের বুক, গুড়ুম। গুড়ুম।

চোখের সামনে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে সমুদ্র-মানব। তিমিটাও সাগরে একটা আলোড়ন তুলে ডুব দেয় জলে। ঠিক এই সময় জাহাজের ওপাশ থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে উন্নি, বাঁচাও। বাঁচাও। ক্যাপটেন আর শঙ্কর ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায় উন্নির দিকে। অন্য সকলে নড়বার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে।

উন্নিকে দেখেই ক্যাপটেন শুধোয়, কি ব্যাপার উন্নি? কে বন্দুক ছুঁড়ল?

সুরাইয়া ক্যাপটেন, সুরাইয়া। ও নিশ্চয়ই খেপে গেছে।

খেপে গেছে!

তাই বোধ হয়। কি আর বলব ক্যাপটেন, কদিন থেকেই মনটা খারাপ। বাড়ীতে ছোট্ট ছেলেটাকে রেখে চলে এসেছি। ছেলেটা আবার আমাকে ছেড়ে মোটেই থাকতে চায় না। নিরিবিলিতে বসে ওর কথা ভাবছিলাম। সুরাইয়ার চিৎকার শুনে সাগরের দিকে তাকাতেই দেখি সাগরের বুকটা ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে। তারপর দেখলাম একটা অদ্ভুত জীব সাগর ফুঁড়ে উঠছে। অবাক হয়ে চেয়ে আছি হঠাৎ মনে হল আমার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেয়ে দেখি সুরাইয়া। ও মানুষের মতো জীবটার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পিছু দিক থেকে ওকে আঁকড়ে ধরলাম, যদি ওর বন্দুকের হাত থেকে ঐ অদ্ভুত মানুষটাকে বাঁচানো যায় এই ভেবে। কিন্তু হল না। তার আগেই দুটো গুলি ছুটে গেল সাগরের দিকে। আমি বললাম, কি করলি সুরাইয়া? সর্বনাশ করলি? ক্যাপটেন তোকে আস্ত রাখবে না। ও তখন মুখ ভেংচে, বন্দুক উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল। ঐ, ঐ দেখুন ক্যাপটেন। সুরাইয়া এদিকেই আসছে। ওর হাতে বন্দুক। ওর দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। আমাকে বাঁচান, ক্যাপটেন। ও খেপে গেছে। সুরাইয়া আমার খুন করবে।

ক্যাপটেনের নির্দেশে, পাঁচ, ছ জন লোক ধরে ফেলে পৃথনকে। উন্নি

ছুটে গিয়ে হাত থেকে কেড়ে নেয় বন্দুকটা। নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে পৃথন আর গজ গজ করছে, আমায় ছেড়ে দাও। ওকে আমি খুন করব।

গর্জে ওঠে ক্যাপটেন, ওর হাত, পা বেঁধে পুরে রাখ একটা ঘরে। আর আমার কথা অগ্রাহ্য করার জন্যে ওর শাস্তি পঁচিশ ঘা চাবুক।

উন্নির ওপরই ভার পড়ে চাবুক চালাবার। মনে মনে ক্রুর হাসি হাসে উন্নি। তার চক্রান্ত সফল। হতভাগা পৃথন ওকে বাধা দিতে গিয়েছিল যাতে উন্নি ওর চরম শত্রু তিরুনালকে গুলি না করতে পারে। প্রতিফল। একটু পরেই তার চাবুকের ঘায়ে যখন পৃথনের পিঠটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তখন শান্তি পাবে উন্নি।

পৃথনকে চার-পাঁচজন খালাসী টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর, হাত, পা বাঁধা অবস্থাতেই ফেলে দেয় মেঝের ওপর। ঘর থেকে পৃথনের চিৎকার ভেসে আসে, ছেড়ে দাও। আমায় তোমরা ছেড়ে দাও। আমি ওকে খুন করব। ওকে গুলি করে মারব।

দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে খালাসীগুলো। ক্রোধে বেশ কিছুক্ষণ গর্জন করে পৃথন। উন্নি তার আদরের দুলাল তিরুনালকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ল, অথচ সে কিছুই করতে পারল না। তবে কেড়ে নিয়েছিল বন্দুকটা। ভেবেছিল খুন করবে উন্নিকে তারই বন্দুক দিয়ে। কিন্তু পালিয়ে এল কুলাঙ্গারটা। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে পৃথন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে উন্নি ঘরে ঢুকছে। ওর হাতে একটা চাবুক। দুচোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আগুন। পৃথনের দিকে চেয়ে ক্রুর হাসি হাসতে হাসতে আর চাবুকটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসছে উন্নি।

॥ ২৭ ॥

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে সাগরে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে শঙ্কর। তিমিটা খেপে গিয়ে বার দুই চেষ্টা করেছে জাহাজটাকে আক্রমণ করতে, কিন্তু অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে এটা। বন্দুক আর বল্লম নিয়ে সবাই প্রাণপণে তিমিটার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় বাঁচলেও রাতে কি যে ঘটবে ভেবে শিউরে ওঠে

শঙ্কর। তিমিটা যদি প্রতিশোধ নিতে রাতে আক্রমণ করে তাহলে বিপদ অনিবার্য। আর তার সম্ভাবনাও যে নেই একথা বলা যায় না, কারণ তিমিটা যতদূর সম্ভব আঘাত পেয়েছে বন্দুক অথবা বল্লমের খোঁচায়। ক্যাপটেন অবশ্য সকলকেই সাবধান করে দিয়েছে। সকলে পালা করে সাগরের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে শঙ্কর। এই সময় স্পষ্ট তার কানে ভেসে আসে ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ শব্দ। ভয়ে শঙ্করের বুকটা কেঁপে ওটে। এর ওপর দূর, বহুদূর থেকে দাঁড়ি টানার ছপ্ ছপ্ শব্দ ওর ভয়টা বাড়িয়ে দেয়। কেবিনে ফিরে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ডিম্ ডিম্, ছপ্ ছপ্ শব্দ ছাপিয়ে একটা আর্তনাদ ভেসে আসে, বাঁ—চা—ও—, কে আছ বাঁ—চা—ও—। সঙ্গে সঙ্গে শিসের মত চাবুকের আওয়াজ ভেসে আসে, 'সপাং সপাং'।

ভয়ে সবাই কাঁপতে সুরু করে। উন্নি পৃথনের ওপর চাবুক চালাচ্ছে।

আজ যেন ভীষণ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার নামছে সাগরের ওপর। সকলের বুক দুমড়ে উঠছে যন্ত্রণায়। হাড় হিম করা ডিম্ ডিম্ শব্দটাও মনে হচ্ছে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে কাঁপছে সবাই। হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে পৃথনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আবার শোনা যায়, তি—রু—না—ল—, তি—রু—।

চমকে ওঠে জাহাজের সবাই। শঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, খোকনবাবু ভয়ে একটা ফাঁকা ড্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গম্ভীর হয়ে ওঠে ক্যাপটেনের মুখ। কোথায় যেন তিরুনাল নামটা শুনেছে। বেশ কিছুক্ষণ ভাবে ক্যাপটেন তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় ঠিক এই নামটাই কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিল সে। কোনো এক জেলের ছেলে সাগরে হারিয়ে যায়। সেই ছেলেটার নামই তিরুনাল। সাগরের ওপর তিরুনালকে অনেকে দেখেছে হারিয়ে যাওয়ার পরও। তাহলে সুরাইয়া কে? কি তার পরিচয়? কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন পৃথন যে ঘরে বন্দী, সেই ঘরের দিকে ছুটে যায়। ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যাপটেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বার বার দরজার ওপর আঘাত করে ক্যাপটেন, উন্নি—, দরজা খোল। উন্নি—, উন্নি—।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। উন্নি একবার দরজার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হাসে, তারপর আবার চাবুকটা শূন্যে তোলে, তিরুনাল, শোন শয়তান,

তোর তিরুনাল আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। আমার বন্দুকের গুলি খেয়ে সে এখন যমের বাড়ি গেছে।

চিৎকার করে ওঠে পৃথন, না না সে বেঁচে আছে সে মরেনি, সে মরতে পারে না।

বিকট শব্দ করে হেসে ওঠে উন্নি। —সে মরে নি, সে মরতে পারে না।

এরপর দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলে, তোর ছেলে যমের বাড়ি গেছে। এবারে তুইও তার কাছে যা।

চাবুকটা আবার শূন্যে তোলে উন্নি, কিন্তু সেটা পৃথনের ওপর পড়ার আগেই প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে জাহাজটা। উন্নি মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে। সকলের সঙ্গে সেও গড়াগড়ি খায়।

এদিকে ডেকের ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতে ক্যাপটেন সমানে চিৎকার করে চলেছে, বন্দুক ছোঁড়, হারপুন ছোঁড়, তীর ধনুক চালাও। সবাই সাবধান।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা ধাক্কা। জাহাজের এক জায়গা থেকে একটা কড় কড় শব্দ ওঠে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে ক্যাপটেন, ফায়ার, ফায়ার। মেরে ফেল ওটাকে। তা নইলে আমাদের সবাইকে মরতে হবে।

সকলেই মেঝের ওপর পড়ে থাকে, ওঠে না। বিপদের সংকেত পেয়ে সকলেই প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

এরপর আর কিছু ঘটল না। সকলেই উঠে পড়ে একে একে। পৃথনকে ছেড়ে দিয়ে উন্নি দরজা খুলে বাইরে আসে। ঠিক এই সময় জাহাজের এক প্রান্ত থেকে ক্যাপটেনের চিৎকার শোনা যায়, শঙ্কর—, শ—ঙ্ক—র—, তুমি কোথায়?

আবার সকলের মুখে নেমে আসে ভয়ের ছায়া। অনেকটা খোঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু শঙ্করের দেখা পাওয়া গেল না।

জাহাজে শোকের ছায়া নেমে এল। কেউ ভাবল শঙ্করকে তিমিতে খেয়েছে, কেউ বলেই ফেলল, এ নিশ্চয়ই সেই হাঙরটার কাজ।

ভাবছে ক্যাপটেন। মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবির মতো ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে একটা সন্দেহের অস্পষ্ট মেঘ মনের মধ্যে বার বার আনাগোনা করছে, শঙ্কর জারোয়াদের শিকার হয়নি তো? ভয়ে ক্যাপটেনের গায়ে কাঁটা দেয়।

রাতে কারও চোখে ঘুম আসে না। জেগে আছে ক্যাপটেন। মাঝে

মাঝে তন্দ্রায় নেমে আসছে ওপরের পাতা, কিন্তু বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে আবার। উঠে পড়ে ক্যাপটেন। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শঙ্করের বিয়োগ ব্যথায় ঘন ঘন জল নেমে আসে দুচোখে।

বাইরের সাগরের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলছিল ক্যাপটেন, হঠাৎ একটা গোঙানি শব্দ শুনে চমকে ওঠে। বুঝতে চেষ্টা করে শব্দের উৎসটা কোথায়। কিছু পরে শব্দটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায় ক্যাপটেন, তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। এই ঘরেই বন্দী হয়ে আছে পৃথন। দরজায় কান পাতে ক্যাপটেন। পৃথন কাঁদছে, মাঝে মাঝে তিরুনালের নাম ধরে ডাকছে আর যন্ত্রনায় গোঙাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে যায় ক্যাপটেন। ভাবে, কে এই সুরাইয়া? তিরুনালের সঙ্গে সুরাইয়ার সম্পর্কই বা কি? ক্যাপটেনের মনে হাজার প্রশ্নের ভিড় জমে। দরজা খুলে ঘরে ঢোকে ক্যাপটেন।

॥ ২৮ ॥

ঘুমোচ্ছে উন্নি। অনেকদিন পরে একটু শান্তিতে ঘুমোচ্ছে সে। পৃথনের পিঠে আজ সে মনের সুখে চাবুক চালিয়েছে। ইচ্ছে ছিল চাবুকের ঘা দিয়েই শেষ করে ফেলবে কিন্তু হল না। তার আশায় ছাই পড়ল। তবু শান্তি পেয়েছে উন্নি; আর সেই শান্তিতেই দু চোখের পাতা এক করতে পেরেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় উন্নির। দুলছে জাহাজটা। উঠতে চেষ্টা করে উন্নি, কিন্তু পড়ে যায়। বাইরে থেকে ক্যাপটেনের গলা শোনা যায়, গো ব্যাক্ পাইলট্। পালিয়ে চল, শীঘ্রি এখান থেকে পালিয়ে চল।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে জাহাজটা। ভেতরে কজন প্রায় বলির পাঁঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপছে। এখনই হয়তো তিমির লেজের ঝাপটায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তলিয়ে যাবে সাগরের জলে।

॥ ২৯ ॥

ডেকের ওপর, একবারে প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল শঙ্কর। তারপর পৃথনের আর্তনাদ কানে আসতেই ছুটে যাচ্ছিল উন্নির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। ঠিক সেই সময় দুলে উঠলো

জাহাজটা আর শঙ্কর জাহাজ থেকে ছিটকে পড়ল সাগরের জলে। প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল শঙ্কর, তার বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। হাজার চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে 'রা' বের করতে পারেনি শঙ্কর। সে ডুবছিল একটু একটু করে হঠাৎ তার কানে এল 'ছপ্ ছপ্' দাঁড় টানার শব্দ। এরপর তিন, চারটে কালো, লম্বা ছায়া এগিয়ে আসে তার দিকে। শঙ্কর চিৎকার করার আগেই কালো কালো, লোহার মতো শক্ত কটা হাত তাকে টেনে তুলে নেয় জল থেকে। শঙ্কর বুঝতে পারে সে ক্যানোর ওপর, আর যারা তাকে টেনে তুলল তারা নিশ্চয়ই ওঙ্গী বা জারোয়া। অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখতে পায় না শঙ্কর, শুধু ভূতের মতো কতকগুলো মূর্তি চোখে পড়ে। তারা সচল, তারা নির্বাকও নয়। ফিস-ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে।

অন্ধকার ভেদ করে শন্ শন্ করে এগিয়ে চলেছে ক্যানোটা। হাত, মুখ বাঁধা অবস্থায় শঙ্কর পড়ে আছে। মনে দারুন ভয়, কারণ সে জানে ওঙ্গী বা জারোয়ারা দারুণ নিষ্ঠুর।

নিঃশব্দে ক্যানোটাকে টেনে নিয়ে চলেছে ভূতের মতো কালো লোকগুলো। মাঝে মাঝে ফিস-ফিস করে কথা বলছে। শঙ্করের কানে দু একটা কথা আসে। প্রায়ই ওরা বলছে, সি-য়া, সি য়া। আবার বলছে, টো—মি—ল্যু—নো, টো—মি—ল্যু—নো।

শঙ্কর ওদের ভাষায় কিছু না বুঝলেও কতকগুলো শব্দের অর্থ জানে, কারণ কিছু দিন আগেই এইসব উপজাতীয়দের নিয়ে লেখা একটা বই পড়েছিল। সি-য়া বলতে ওরা ভূত পেতকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু টো—মি—ল্যু—নো কথাটার অর্থ কিছুতেই মনে করতে পারে না। মাঝে মাঝে লোকগুলো 'লারোম, লারোম' করছে আর কি সব খাচ্ছে।

লারোমের নাম শুনেছে শঙ্কর। ওঙ্গীদের প্রিয় খাদ্য। কাঁঠালের মতো প্যাণ্ড্যাসাস বলে এক রকমের ফল হয়। পাকলে ওরা ঐ ফল সেদ্ধ করে তারপর ভেঙে বীচি বের করে। এরপর কোয়াগুলোর রসের সঙ্গে শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে খেজুর রসের মতো জাল দেয়। রসটা মরে যখন খেজুরের গুড়ের মতো হয় তখন সেই ঘন পদার্থটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে পাতা দিয়ে জড়িয়ে রেখে দেয়। পরে খায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ক্যানো এসে থামে কিনারায়। সাগরের প্রচণ্ড গর্জন। দুজন লোক সেই বিক্ষুব্ধ ঢেউ ভেঙে শঙ্করকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় তীরের

দিকে। এরপর বালির ওপর নামায়। দু চোখ মেলে তাকায় শঙ্কর। ভয়ে ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কতকগুলো কালো কালো ভূতের মতো বীভৎস মুখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাদের কারো হাতে মশাল, কেউ বা তীর ধনুক সঙ্গে নিয়েই এসেছে, কেউ আবার কাঠের তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সকলেই প্রায় উলঙ্গ। পরনে শুধু নেংটি। গায়ের রং আলকাতরার মতো কালো। মুখে গোঁফ দাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বেঁটে, দেহ বেশ মজবুত। চক চক করছে হাতের পেশী। মাথায় কোঁকড়ান চুল। হাত, বুক আর কপালে উলকি। সকলের চোখ শঙ্করের ওপর।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার তারা শঙ্করকে নিয়ে এগোয়। কিছুটা পথ যাবার পর এক জায়গায় শঙ্করকে নামিয়ে একজন একটা মৌচাকের মতো কুটীরের নীচে দাঁড়ায়। পাশাপাশি একই রকমের আরও আনেকগুলো মৌচাক কুটীর। এই সময় দু' একজন লোক কাঠের তলোয়ার দিয়ে শঙ্করকে খোঁচা মারে। তাদের দেখাদেখি আরও দুজন এগিয়ে আসছিল মজা করতে, কিন্তু দলের মধ্যে থেকে কে যেন বলে ওঠে, মা—পানাম, মা—পানাম।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে সরে দাঁড়ায়। যে লোকটা একটু আগে চলে গিয়েছিল সে হাতে একটা মশাল নিয়ে এগিয়ে আসছে, আর তার পিছু পিছু হেলতে দুলতে আসছে আর একজন লোক। মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ দেখেই। মনে হবে লোকটা এদের মাথা। সকলে ঘাড় হেঁট করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ঘিরে ধরে শঙ্করকে। মোড়ল বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শঙ্করের দিকে। তারপর বলে, টো—মি—ল্যু—নো, মা—আ—ফাই।

সঙ্গে সঙ্গে আবার দুজন লোক মশাল হাতে ছুটে যায় মৌচাক-কুটীরগুলোর দিকে। একটু পরেই আর একজন লোককে নিয়ে ফিরে আসে। তার দিকে তাকাতেই ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায় শঙ্করের।

লোকটার হাতে একটা বাঁশ। তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বেশ কিছু বাঁশ-পাতা। লোকটা আবল-তাবল বকে, আর শঙ্করের গায়ে বাঁশ পাতার ঝাপ্টা মারে। শঙ্কর বুঝতে পারে লোকটা ওঝা। ওরা ভেবেছে শঙ্করকে ভূতে পেয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ ঝাড় ফুঁক করার পর ওরা আবার শঙ্করকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তোলে একটা পরিত্যক্ত ঘরে। ঘরটা দেখে শঙ্কর ভাবে এটা নিশ্চয়ই একটা বারোয়ারি ঘর। একসঙ্গে এখানে অনেক লোক থাকে। তবে বর্তমানে কেউ থাকে না বলেই মনে নয়। ঘরটা দেখতে ঠিক ছাতার

মতো। চারদিকে বাঁশের খুঁটি। মাথাটা পাতা দিয়ে ছাওয়া। সার সার বাঁশের মাচা। মাঝখানে একটা আগুনের কুণ্ড। তবে এখন আর আগুন নেই। চালার এখানে ওখানে কতকগুলো ঝিনুকের মালা ঝুলছে। একদিকে দু' একটা ভাঙা বেতের ঝুড়ি, আর গোটাকতক ভাঙা কাঠের বালতিও রয়েছে।

লোকগুলো একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর একটা মাচার ওপর শঙ্করকে ফেলে দরজার ঝাঁপ বন্ধ করে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে শঙ্কর। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ক্যাপটেন আর সঙ্গীদের কথা। তারা এখন কি করছে কে জানে। দু' একবার হাতের বাঁধন কেটে পালাবার কথা মনে আসে, বাঁধন খোলার চেষ্টাও করে শঙ্কর কিন্তু ব্যর্থ হয়। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দু চোখ বন্ধ করে শঙ্কর। কখন যে চোখে ঘুম নেমেছিল বুঝতে পারে না কিন্তু হঠাৎ ভেঙে যায় ঘুম। তার কুটীরের চার পাশ থেকে চিৎকার ভেসে আসছে, তার সঙ্গে ডিম, ডিম শব্দ। একটু পরেই ঝাঁপ খুলে কিছু লোক ঘরে ঢোকে। রাতের অন্ধকার কেটে গেছে। লোকগুলো শঙ্করের ওপর ঝুঁকে পড়ে একবার, তারপর ধরাধরি করে আবার বাইরে নিয়ে যায়।

বারোয়ারি কুটীরের নীচে উলঙ্গ, বেঁটে, কালো কালো বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে।

শঙ্করকে দেখেই সকলে হৈ হৈ করে ওঠে! এরপর তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় একটা শুকনো, মরা নারকোল গাছের গোড়ায়। গাছটার গায়ে অসংখ্য ছোট বড় গর্ত। শঙ্করকে সেই গাছের সঙ্গে ভাল করে বাঁধে। তারপর বাঁশের টুকরো দিয়ে শুকনো গাছটার গায়ে আঘাত করে আর কী সব মন্ত্র বলে।

সামনে তখন নাচ গান সুরু হয়েছে। দু' একজন শূয়োরের ছাল ছাড়াচ্ছে। কেউ কেউ নারকোল থেকে দুধ বের করছে। আজ ওদের উৎসব। খুন করবে বিদেশীকে নির্মমভাবে, আর তাই দেখতে দেখতে ওরা নাচবে, গান করবে আর শূয়োরের হাড় চিবোবে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ভাবছে শঙ্কর কি করে বাঁচা যায়। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে যদি তার সঙ্গীদের দেখতে পায় এই আশায়। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ। কেউ তার উদ্ধারের জন্যে আসে না। হতাশ হয়ে

চরম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে শঙ্কর। হঠাৎ একজন লোক নারকোল গাছটার ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে চিৎকার করে, কান খেজুরা, কান খেজুরা।

তার কথায় সকলেই সেদিকে চায়, তার পর আনন্দে চিৎকার সুরু করে। শঙ্কর কোনো রকমে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে ওপরের দিকে চায় একবার। নারকোল গাছটার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটার পর একটা বিছে। বিরাট, বীভৎস। শঙ্কর জানে ঐ বিছে গুলোর বিষ মারাত্মক। ওদের কামড়ও যন্ত্রণাদায়ক। বিছের পালগুলো যতই শঙ্করের দিকে এগোয়, লোকগুলো আনন্দে ততই চিৎকার করে। ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে শঙ্কর।

।। ৩০ ।।

ক্যাপটেনের নির্দেশ পাওয়ার পর ছুটতে আরম্ভ করে জাহাজটা। ভয়ার্ত পাইলট, ক্যাপটেন সকলের কাছেই এখন প্রাণটাই বড় হয়ে উঠছে।

ঝক্...ঝক্ · ঝক্ · ঝক্·· ঝক্ ··। ছুটছে জাহাজটা জোরে, আরও জোরে। ওদিকে পিছু পিছু ছুটে আসছে সেই ভয়াল, ভয়ঙ্কর, ক্ষিপ্ত তিমিটা। বুঝি আর কারও রক্ষে নেই। ক্যাপটেন সমানে চিৎকার করে চলেছে, আরও জোরে, আরও জোরে।

ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা চলার পর জাহাজটা বিশ্রাম নেবার জন্যে এক মিনিট দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সাগরের জল ভেদ করে ওঠে ফোয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেনের চিৎকার, হ্বাট্ হোয়েল, হ্বাট ডেভিল। পালাও। জোরে, আরও জোরে।

ঝক্...ঝক্ ঝক্ · ঝক্...ঝক্...। ছুটতে সুরু করে ট্রলারটা। ইঞ্জিন গরম। মনে হয় তার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হবে, সে ভেঙে পড়বে সাগরের জলে; অথবা তারও দম ফুরিয়ে আসবে একটু পরেই। চিৎকার করছে ক্যাপটেন, আরও জোরে, আরও জোরে।

ছুটে চলেছে কলের জাহাজ। দিক ভ্রষ্ট, লক্ষ্যহীণ। তবু একটা লক্ষ্য আছে, সে হল সকলকে বাঁচানো। জাহাজের ভেতরে সবাই কাঁপছে। সকলের এক ভয়, এই বুঝি তিমিটার লেজের ঝাপ্টায় তলিয়ে যায় জাহাজটা সাগরের নীচে।

বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই, দিনরাতের হিসেব পর্যন্ত নেই। পাগল প্রায়

প্রত্যেকটি লোক। পাগল প্রায় ক্যাপটেনও। তার মুখ থেকে বার বার শুধু একটা কথাই শোনা যায়, জোরে, আরও জোরে। রান্, মাই শিপ, রান।

কিন্তু থেমে গেল জাহাজটা। ক্যাপটেনের হাজার চিৎকার, পাইলটের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল জাহাজটা।

ইঞ্জিন রুমের ঘরের দরজায় আঘাতের পর আঘাত করে ক্যাপটেন, কী হল? থামলে কেন?

জাহাজ আর চলবে না ক্যাপটেন।

সে কি!

হ্যাঁ, ক্যাপটেন। ইঞ্জিনটা বিগড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

ও গড্।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ক্যাপটেন।

ভেঙে পড়বেন না স্যার।

আমি ওদের নিষেধ করেছিলাম, পাইলট। কিন্তু ওরা ভুল করল। এতগুলো প্রাণী আমার চোখের সামনে ডুবে মরবে এ আমি ভাবতে পারছি না। আই কাণ্ট থিঙ্ক ইট্, আই কাণ্ট থিঙ্ক ইট্। আচ্ছা পাইলট আমরা এখন কোথায়?

ঠিক বুঝতে পারছি না ক্যাপটেন।

স্বাভাবিক। স্বাভবিক। জানো পাইলট শঙ্কর গিয়ে আমার বুকটা ভেঙে দিয়েছে।

যা গেছে তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই ক্যাপটেন!

ঠিক, ঠিক বলেছ পাইলট। যারা আছে তাদের কথাই ভাবতে হবে এখন। ওদিকে ডেমন, স্বার্ট হোয়েল ছুটে আসছে আমাদের ধ্বংস করতে। এদিকে জাহাজের খাদ্যও ফুরিয়ে এসেছে। বুঝতে পারছি না কি করে এটা হল।

স্টকে তেলও আর বেশী নেই, ক্যাপটেন।

চিন্তিত মুখে ক্যাপটেন পায়চারি সুরু করে ডেকের ওপর। এইসময় রঞ্জন বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বলে, শুনেছ রঞ্জন, খাদ্য নেই, তেল নেই। এখন দাঁড়িয়ে মরতে হবে।

সাগরে মাছ তো ফুরোয়নি, ক্যাপটেন। ঠিক বলেছ রঞ্জন। কিন্তু স্বার্ট-ডেভিল, যে আমাদের তাড়া করেছে?

মনে হচ্ছে আর ভয় নেই। তিমিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

বিশ্বাস নেই রঞ্জন, কিছু বিশ্বাস নেই। হয়তো রাক্ষসটা দূরে কোথাও রয়েছে। সুযোগ পেলেই ছুটে আসবে।

ওসব কথা ভেবে লাভ নেই, ক্যাপটেন। মরতে হয় যুদ্ধ করেই মরব। কাপুরুষের মত ভয়ে পিছিয়ে যাব না। তাছাড়া আমাদের অভিযান এখনও সফল হয়নি। তিমির ভয়ে পিছিয়ে থাকলে সমুদ্র মানবের আর দেখা পাওয়া যাবে না।

মনে হচ্ছে ফিরে যাওয়াই ভাল।

তা হয় না ক্যাপটেন। আমরা যদি ফিরি তাহলে শঙ্করের আত্মা ক্ষুব্ধ হবে। সাগরের ঐ সমুদ্র মানবকে আমরা দেশবাসীকে উপহার দোব। এই ছিল শঙ্করের মনের আসল ইচ্ছে। তার এ ইচ্ছে আমরা পূর্ণ করবই।

ঠিক, ঠিক বলেছ রঞ্জন। আজ থেকেই আমরা অনুসন্ধান চালাব।

॥ ৩১ ॥

ঠিক হল তিমির আক্রমণের আশঙ্কা থাকলেও আবার সমুদ্র মানবের উদ্দ্যেশে, অনুসন্ধান চালানো হবে তবে আত্মরক্ষা করা যায় এমন দূরত্ব বজায় রেখে ট্রলারটা তার পিছু নেবে। কিন্তু অনুসন্ধান চালাব বললেই চালানো যায় না। সকাল থেকে চোখে দূরবীণ লাগিয়েও তিমি বা ফোয়ারার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দূরবীণে ধরা পড়ল। পাখনা মেলে শূন্য দিয়ে ভেসে চলেছে। কখনও দূর সাগরের ঢেউয়ের মাথায় একবার হয়তো সেকেণ্ডের জন্যে একটা হাঙ্গরের মুখ ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায় জলের তলায়। সারাদিন খোঁজ করেও তিমিটাকে দেখা গেল না। ক্যাপটেন রঞ্জনকে ডেকে বলল, রঞ্জন, তোমায় আবার সাগরের তলায় নামতে হবে। আমরা কোথায়, কোন বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছি কিনা বুঝতে পারছি না। জল ফোনের সাহায্য না নিলেও বোঝা যাচ্ছে এখানে সাগরের গভীরতা অনেক বেশী।

আমি প্রস্তুত, কাপটেন।

তাহলে আর দেরী না করে এখনই কাজ সুরু কর। সমুদ্র মানব জগতের বিস্ময়। ওকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই রঞ্জনকে নিয়ে ওর ব্যাথিশেলটা সাগরের জলে নামতে সুরু করে।

নামছে তো নামছেই রঞ্জন। আলোর রাজ্যে ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে তার ব্যাথিশেল। ওখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকছে রঞ্জনের ব্যাথিশেলের সার্চলাইটের তীক্ষ্ণ আলো। নিভিয়ে দেয় রঞ্জন সার্চলাইটটা। কারণ ও শুনেছে গভীর জলের মাছদের গা থেকে নাকি আলো বেরোয়। সার্চলাইট নিভে গেল, তবু কিছুই রঞ্জনের চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ কাটল। অন্ধকারটা অসহ্য লাগছে রঞ্জনের কাছে। সার্চলাইটের সুইচ টিপতে গিয়েই রঞ্জনের হাতটা থেমে যায়। টর্চের মত একটা আলো একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবে রঞ্জন, গভীর সাগরের নীচে টর্চ জ্বালাবে কে? সার্চলাইটটা ওর সন্দেহ দূর করে। একটা চিংড়ি মাছ। আলোটা নিভেয়ে দেয় রঞ্জন। প্রায় মিনিটখানেক পরে আবার অন্ধকার রাজ্যে ঢোকে বঞ্জনের ব্যাথিশেলটা। অন্ধকার সাগরের জল যেন কালো আকাশ। আব সেই আকাশের এখানে ওখানে জ্বলছে আর নিভছে হাজার হাজার তারা। রাতের আকাশের সঙ্গে অন্ধকার সাগর-রাজ্যের পার্থক্য নেই। রাতের আকাশের মতো এখানেও ফুটে রয়েছে অসংখ্য তারা। মিটিমিটি জ্বলছে, আষার নিভে যাচ্ছে। তফাৎ শুধু এই আকাশে গ্রহ আছে, উপগ্রহ আছে, তারা আছে। এখানে শুধু তারা। তারাদের আবার বিভিন্ন রং। লাল নীল, ধূসর, সাদা, সবুজ। এদের যেমনি বিচিত্র রং, তেমনি বিচিত্র দেহের গড়ন। একটা স্কুইড মাছ লাল, নীল, ধূসর আলো জ্বালিয়ে ছুটে চলেছে একটা সবুজ আর বেগুনী আলোর পিছু পিছু। সেটা উড়োজাহাজ নয়, একটা কুড়ুল মাছ। চেহারাটা ঠিক কুড়ুলের মতো। দুটো নলের ডগায় দুটো চোখ। কৌতুহল মেটাতে রঞ্জন মাঝে মাঝে সার্চলাইট অন্ করছে, পরক্ষণেই অফ করে দিচ্ছে। আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তারাদের জগতে এসে পড়ে রঞ্জন। মাছগুলোর রং আর গড়ন দেখে অবাক হয়ে রঞ্জন। কোনাটার মাথায় লম্বা শুঁয়ো, কারও লেজটা ঝাঁটার মতো, কারও বা লম্বা দাড়ি গোঁফ। আর সে সবের ডগায় জ্বলছে বাতি। কালো, ঘোর লাল, লালচে কালো।

এক জায়গায় একটা এ্যাংগলার চোখে পড়ে। বিরাট মুখ, সার সার তীক্ষ্ণ

দাঁত। ওপরের চোয়াল থেকে একটা কাঁটা সোজা উঠে গেছে ওপরে। কাঁটাটার মাথা গোল। সেটা একটা উজ্জ্বল বালব। একটা ছোট্ট মাছ সেই আলোটা দেখে ছুটে যায় সেদিকে। ভেবেছে খাবার জিনিস। কিন্তু বেচারা জানে না ওটা তার যম। আলোটার কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাংগলারের বিকট 'হাঁ' এর মধ্যে চলে যায় সে।

অবাক হয়ে দেখছে রঞ্জন পাতাল রাজ্যের আকাশটাকে। ছোট্ট মাছটা এ্যাংগলারের পেটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা অফ করে দেয় রঞ্জন এক সেকেণ্ডের জন্যে, তারপর, আবার লাইটটা অন্ করতেই চমকে ওঠে। শয়তানের মতো দেখতে তার সামনে ওটা কি ? তার দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে আসছে !

॥ ৩২ ॥

আচ্ছা ক্যাপটেন কোন্ সাগরের জল লাল ?

খোকনবাবুর দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বলে, লোহিত সাগরের।

বিরাট কাণ্ড ! কিন্তু লাল কেন ?

লাল লাল শেওলার জন্যেই ওর রং লাল দেখায়।

সাগরে ঢেউ ওঠে কেন ক্যাপটেন ?

ভয়ার্ত, চিন্তিত ক্যাপটেন খোকনবাবুর প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলে, বাতাসের জন্যে। বাতাস এসে সাগরের জলে ধাক্কা মারে। ধাক্কা খেয়ে সেখানকার জল সরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গার জল সেখানে ছুটে আসে। এইভাবে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়।

ঢেউ যদি না থাকত তাহলে জাহাজে চড়ে ঘুরতে কি মজাই না লাগত !

ঢেউ না থাকলে জলের অধিবাসীরা বাঁচত কিনা সন্দেহ। ঢেউয়ের ঝাপ্টায় বাতাসের অক্সিজেন জলের সঙ্গে মিশে যায়। এই অক্সিজেন নিয়েই সাগরের অধিবাসীরা বেঁচে থাকে।

বিরাট কাণ্ড ! সাগরের জল যদি খাওয়া যেত।

অনেক সাগরের জল মিষ্টিও হয় খোকনবাবু। যেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, বেশী ঠাণ্ডা, সেখানে সাগরের জল মিষ্টি।

আচ্ছা ক্যাপটেন, সাগরে মুক্তো পাওয়া যায় ?

পাওয়া যায়।

বিরাট কাণ্ড! সোনা পাওয়া যায়। মুক্তো পাওয়া যায়।

সত্যিই তাই খোকনবাবু। সাগরের তলায় যে শুক্তি জন্মায় তার ভেতরেই থাকে সাদা, গোলাপী, কালো মুক্ত। শুক্তির যখন মুখ খুলে থাকে সেই সময় যদি মুখের মধ্যে বালি ঢুকে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শুক্তিব দেহে যন্ত্রণা সুরু হয়। সেই সময় তার দেহ থেকে একরকম রস বেরোয়। ঐ রস বালির কণাকে ঢেকে দিলেই তার যন্ত্রণা কমে। আর ঐ বালিব কণাকে ঘিরে যে গোলাকার জিনিসটা তৈরী হয় তার নাম মুক্তো।

বিরাট কাণ্ড! আমি আর বাড়ী যাব না, ক্যাপটেন। এইখানেই থাকব। ডুব দোব আর মুক্তো তুলব, ডুব দোব, আর—

আর সেই সময় অক্টোপাসের আটটা শুঁড় এগিযে আসবে তোমায় জড়িয়ে ধরতে।

বিরাট কাণ্ড! তাহলে বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল।

এই সময় রঞ্জনের ফোন আসে।

হ্যালো—কি ব্যাপার? এ্যা! বীভৎস, বিশ্রী বড় বড় চোখ?

—মাথাটা বিরাট!...ভয় নেই। ওটা একটা শয়তান মাছ। যাই হোক তুমি উঠে এস।

॥ ৩৩ ॥

সন্ধেবেলা। ক্যাপটেনের কেবিন। ঘরের মধ্যে ক্যাপটেন আর উম্নির মধ্যে কথা হচ্ছে।

অদ্ভুত! তুমি বলছ ও লোকটা তিরুনালের বাবা নয়?

হ্যাঁ, ক্যাপটেন! ওর মনে কোনো কু-মতলব আছে।

কিন্তু ও আমায় সেদিন বলেছে যে ওর নাম পৃথন। তিরুনাল ওর ছেলে।

পৃথন আমার নিজের দাদা, ক্যাপটেন। আমার দাদাকে চিনতে পারব না? আমি জানি তিরুর শোকে দাদা আমার মরে গেছে।

উন্নি একবার কান্নার ভান করে।

সুরাইয়া তাহলে পৃথন নয়? কিন্তু—

আমি বলছি ক্যাপটেন ও নিশ্চয়ই কোনো বদমাইস লোক। বাপ হয়ে ছেলেকে কেউ গুলি করতে পারে? কিন্তু সেদিন আমি নিজের চোখে দেখলাম তিমির ওপর সমুদ্র মানবকে দেখেই সুরাইয়া বন্দুক ছুঁড়ল।

ঠিক, ঠিক বলেছ উন্নি।

সেদিন পিঠে চাবুক পড়তেই সব স্বীকার করল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, ক্যাপটেন। আরও আছে ক্যাপটেন। তবে সে কথা আপনার না শোনাই ভাল।

কেন?

সে কথা শুনলে আপনি সুরাইয়ার হাত, পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে বলবেন।

কথাটা শোনার জন্যে ক্যাপটেনের আগ্রহটা আরও বেড়ে যায়।

আমি তোমায় আদেশ করছি কিছু না লুকিয়ে কথাটা আমায় বল।

আপনি যখন আদেশ করছেন তখন বলতেই হবে। সেদিন চাবুক খাবার পর সুরাইয়ার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। মাঝে মাঝে আপনার আর শঙ্করের নামে গালিগালা করছিল। এরপর জাহাজটা যখন তিমির ধাক্কায় হঠাৎ দুলে উঠলো আমি পড়ে গেলাম মেঝের ওপর। সুরাইয়া ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি অনেক কষ্টে বাইরে এসে যা দেখলাম তা শুনলে আপনার—ভনিতা রেখে খুলে বল কি ছ

দেখলাম সুরাইয়া টলতে টলতে শঙ্করবাবুর দিকে এগোচ্ছে। শঙ্করবাবুও নিজেকে সামলাচ্ছিলেন তবে তাঁর চোখ ছিল সাগরের দিকে। সুরাইয়া পিছুদিক থেকে শঙ্করবাবুকে—

কি হল থামলে কেন?

শঙ্করবাবুকে ঠেলা মেরে ফেলে দিল। শঙ্করবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ল সাগরের জলে।

উন্নি—, শয়তান সুরাইয়া। শোন উন্নি তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে, তাহলে শয়তানটাকে আমি চরম শাস্তি দোব।

ক্রুর হাসি হাসতে হাসতে উন্নি ক্যাপটেনের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

॥ ৩৪ ॥

সকাল হতে না হতেই ঠাকুর এসে ক্যাপটেনকে ডেকে তুলে যা বলল তা তা শুনে ক্যাপটেনের চক্ষুস্থির।

হুজুর, গংগলুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি! সব ঘরগুলো দেখেছ?

হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেলাম না। চল আর একবার খুঁজে দেখা যাক।

কিন্তু সত্যিই গংগলুর খোঁজ পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা আর ভয়ে সকলের মুখের হাসি উবে গেল। জলজ্যান্ত মানুষটা গেল কোথায়! রাতে ঠাকুরের কাছে শুয়েছিল গংগলু। দরজাটা ভেজানো ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে যায় ঠাকুর। পাশে গংগলু নেই। অন্যদিন গংগলুকে ডেকে তুলতে হয়, অথচ আজ তার আগে উঠে গংগলু গেল কোথায়। ভালমন্দ ভাবতে ভাবতে বাইরে আসে ঠাকুর। কিন্তু গংগলুকে কোথাও দেখতে পেল না।

ভয়। প্রাণের ভয়। সারাটা দিন ভয়ের মধ্যেই কেটে যায়। আসল রহস্যের সমাধান হল না। দেখতে দেখতে রাত নেমে আসে সাগরে। ক্যাপটেনের আদেশে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে। শুধু পৃথন তখনও বাইরে। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে সাগরের দিকে। বড় একটা ঢেউয়ের শব্দ কানে এলেই মনটা ওর আনন্দে নেচে ওঠে, এই বুঝি তিরুনালকে দেখতে পাবে সে। কিন্তু ঢেউয়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই মিইয়ে যায় পৃথনের মনটা। আজও তিরুনালের জন্যেই বেঁচে আছে পৃথন। ওর বিশ্বাস তিরুনাল ওকে চিনতে পারবে, ওর বুকে ফিরে আসবে।

ঘনিয়ে আসছে সাগরের ওপর গভীর, কালো অন্ধকার। জাহাজে একটা থমথমে ভাব। ভীত সন্ত্রস্ত লোকগুলো সকাল করে খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে।

বিছানায় শুয়েছিল ক্যাপটেন কিন্তু ঘুম আসছিল না চোখে। মনে এক চিন্তা, গংগলু গেল কোথায়? ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় দশটা। হঠাৎ কেঁপে ওঠে জাহাজটা। উঠে পড়ে ক্যাপটেন। গায়ে একটা চাদর চাপিয়ে জানালার

কাছে যায়। জানলা দিয়ে তাকায় বাইরের আকাশটার দিকে। আকাশে মেঘ নেই। এক আকাশ তারা। ঠাণ্ডা কনকনে একটা বাতাস বইছে সাগরের ওপর দিয়ে। কাঁপতে সুরু করে ক্যাপটেন। জানলাটা বন্ধ করে ফিরে এসে সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছে, এমন সময় অস্পষ্ট একটা গানের সুর ভেসে আসে তার কানে। কে যেন দূর, বহুদূর থেকে গান গাইছে। তবে এ যেন গান নয়, কারও বুকফাটা কান্না। গান গাইতে গাইতে কেউ বোধহয় কাঁদছে।

আয়—
ওরে আয়, আয়, আয়—
আমি একা, একা—
নেই প্রাণ,
নেই মন,
নেই ভালবাসা।
এখানে কেউ নেই,
মানুষ নেই,
ফাঁকা, সব ফাঁকা—
এই সাগর, এই পৃথিবীটা,
সব ফাঁকা।
তুই আয়—,
চলে আ—য়—।

ঘর খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে ক্যাপটেন। টর্চটা জেলে ডেকের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে বেড়ায় আর চিৎকার করে, কে কাঁদে? কে তুমি?

ক্যাপটেনের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে উন্নি, ঠাকুর, খোকনবাবু।

খোকনবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, ভূ—উ—ত—। উন্নি দাঁতে দাঁতে ঘষে বলে, ভূত না আকার ছাই। এ নিশ্চয়ই সুরাইয়া, ক্যাপটেন। আমি দেখছি।

উন্নি দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। একটু পরেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায়, খু—ন—, খু—ন—

তারপরই ঝড়ের বেগে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে উন্নি। ক্যাপটেন শুধোয়, কি হল উন্নি?

ভয়ে কাঁপছে উন্নি। মুখটা নীল। গায়ের এখানে ওখানে রক্তের ছিটে। কথা কইতে পারছে না। ইঞ্জিন ঘরের দিকে হাত দেখিয়ে কোনো রকমে বলে খু—ন—

কে খুন হল ?

উন্নি কিছু বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলতে পারে না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় ডেকের ওপর।

সকলে সভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। খোকনবাবু ইঞ্জিনঘরের দিকে চেয়ে বলে ভূ—উ—ত

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি যায় সেদিকে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কে যেন টলতে টলতে এগিয়ে আসছে।

॥ ৩৫ ॥

একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে পড়ে আছে শঙ্কর। কদিন বলতে গেলে একরকম খাওয়াই হয় নি। এর ওপর গায়ে এখনও যন্ত্রণা। কান খেজুরার কামড় খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শঙ্কর। জ্ঞান ফেরার পর দেখে সে একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী। হাত, পা বন্ধনমুক্ত, কিন্তু পালাবার উপায় নেই। বাইরে দুজন ওঙ্গী তীর ধনুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। পালাবার সময় দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। বিষাক্ত তীর এসে ঝাঁজরা করে দেবে বুকটা। আবার এই অন্ধকার ঘরে বসে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা আরও যন্ত্রণাদায়ক। তাকে নিয়ে ওরা যে কি করবে বুঝতে পারছে না শঙ্কর। তবে আদর করে খাওয়াবে না নিশ্চয়ই, আর বেশীদিন বাঁচিয়েও রাখবে না। শঙ্করের ধারণা এরা ওঙ্গী, জারোয়া নয়; আর দ্বীপটা খুব সম্ভব চাওরা নয়। রীতি, নীতি, পোশাক, পরিচ্ছদ দেখে শঙ্করের মনে এই কথাটাই বার বার উদয় হয়। যাই হোক বাঁচতে হবে তাকে, বাঁচার জন্যে চেষ্টাও করতে হবে। এভাবে তিল তিল করে মরতে প্রাণ চায় না। তার চেয়ে ওদের বিষাক্ত তীরে যদি প্রাণটা যাও সেও ভাল।

দেওয়ালের গায়ে কান রাখে, শঙ্কর। বাইরে কজন লোক আছে বুঝতে চেষ্টা করে। গতকাল ওদেরই একজন বার বার 'উইং আইচ্' কথাটা উচ্চারণ করছিল। 'উইং আইচ্' ওদের একটা উৎসব। মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে

এই উৎসবে ঘোষণা করা হয়। বিয়েতে লোকজন খাওয়ান হয় না। ওদের ভোজ হয় এই 'উইং আইচ্' উৎসবে। কোনো বাড়িতে 'উইং আইচ্' উৎসব হলে মেতে ওঠে পাড়াটা। মেয়ের বাবা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব; বিয়ের উপযুক্ত ছেলেদের নেমন্তন্ন করে। বিবাহযোগ্য ছেলেরা এসে মেয়ে পছন্দ করে।

শঙ্কর ভাবে খুব সম্ভব আজই সেই উৎসব সুরু। মেয়ের বাপের বাড়ি খুব কাছেই। সকাল থেকেই মৌচাক-কুটীরগুলো থেকে হৈ, হুল্লোর, চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ আসে। মাঝে মাঝে বিচিত্র ধরনের বাজনার বিদঘুটে আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে মনে শঙ্কর ভাবে যেমন করেই হোক আজ রাতেই, এখানকার সকলেই যখন উৎসবের আনন্দে মেতে থাকবে সেই সময়, পালাতে হবে। এখান থেকে সাগর বেশী দূরে নয়। সেদিন ক্যানো থেকে নেমে বেশী হাঁটতে হয়নি ওদের। কাছাকাছি একজায়গায় গাছের গুঁড়ি থেকে ক্যানো তৈরী করছিল কিছু ওঙ্গী। আর এক জায়গায় একটা ওঙ্গী পরিবার নারকোল পাতার 'নভ' (ঘা গরা) তৈরী করে বিক্রি করে। পালাবার সময় ওদের চোখে পড়ার ভয় আছে, তবে রাতের বেলায় সে ভয় নেই। সুতরাং রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে যে করেই হোক পালাতে হবে, তারপর সাগরের পার থেকে একটা ক্যানো যোগাড় করা শক্ত হবে না। সেদিন বালির ওপর সার সার বেশ কিছু ক্যানো পড়ে থাকতে দেখেছিল শঙ্কর। নিজে সে নৌকো চালাতে জানে। দেশের নদীতে কতবার প্রবাহ ঠেলে উল্টোমুখে নৌকো চালিয়েছে সে। অবশ্য সাগরে নৌকো নিয়ে নামা বিপজ্জনক, আর কষ্টকরও। তার ওপর একা মানুষ সে। তবু, তবু তাকে পালাতেই হবে। এখানে পড়ে থাকার অর্থই অন্ধকারের মধ্যে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করা। মরতে হয় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেই মরবে সে। সাগরে নৌকো ভসাবার পর ট্রলারটাকে খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

কদিন ভালভাবে খাওয়া হয় নি শঙ্করের। মাঝে মাঝে ওরা একটা নারকোল ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরের ভেতর মজা দেখার জন্যে। খিদে যে কি ভয়ানক তা এ কদিন না খেয়েই শঙ্কর বেশ বুঝতে পেরেছে। খিদের জ্বালায় দাঁত দিয়েই নারকোলের শক্ত খোসা ছাড়িয়েছে। ঠোঁট আর মাড়ি কেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে জামা ভিজিয়ে দিয়েছে। তবু থামেনি শঙ্কর যতক্ষণ না তার মিষ্টি জল আর পুরু শাঁস দিয়ে পেট ভরাতে পেরেছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে দ্বীপটা। দূর থেকে উইং আইচ উৎসবের সোরগোল ভেসে আসছে। দেওয়ালের গায়ে আর একবার কান পাতে শঙ্কর। বুঝতে চেষ্টা করে কেউ পাহারা দিচ্ছে কি না। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো কথাবার্ত্তা বা চলাফেরার শব্দ শুনতে পায় না।

এরপর কিছুক্ষণের চেষ্টায় চালের এক জায়গায় বাঁশ আর বেত সরিয়ে কোনোরকমে মানুষ বের হবার মত একটা ফাঁক সৃষ্টি করে। তারপর সেখান দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে নেয় বাইরেটা। অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে নারকোল গাছগুলো। কিছু দূরেই একটা 'কিনেম' অর্থাৎ কুটীরের সমষ্টি। তার একটার চারধারে বেশ কিছু লোকের ভিড়। দু'একজন মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে লক্ষ্য নেই কারও। মনে হয় কাউকে পাহারায় নিযুক্ত রেখে ওরা নিশ্চিন্ত। দুচোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখে শঙ্কর। দেখে যেন সাধমেটে না। চারদিক অন্ধকারে মোড়া, তব চারধার ফাঁকা। আবদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ বাতাসও বইছে। একদিন অন্ধকার ঘরে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল শঙ্কর। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নেয় শঙ্কর। নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে সে একটু একটু করে। এরপর আর একবার দেখে নেয় চারপাশ। ভাবে উল্টো দিক দিয়ে পালাবে। কাছাকাছি কেউ আছে কিনা বুঝতে পারে না। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। ঘর থেকে কিছু নারকোল খোলা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে মাথা বের করে দরজার উল্টোদিকে কিছু খোলা ছুঁড়ে দেয় জোরে। একটা শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন ওঙ্গী তীর, ধনুক হাতে ছুটে যায় সেদিকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চায়। তারপর আবার দরজার কাছে ফিরে যায়। শঙ্কর আবার কিছু খোলা ছোঁড়ে ঠিক আগের মতো। লোকটা আবার ছুটে যায়। তবে আগের মতো বেশীদূর এগোয় না। মনে হয় ও ভাবছে এটা 'সিয়া' বা অপদেবতার কাজ। শঙ্কর বুঝতে পারে একজন লোক পাহারায় নিযুক্ত। মনে বেশ কিছুটা সাহস ফিরে আসে। লোকটা ফিরে যাবার পর শঙ্কর আরও দুবার নারকোল খোলা ছোঁড়ে, কিন্তু লোকটা শব্দ শুনে আর নড়ে না। এই সুযোগ। শঙ্কর চাল থেকে দরজার বিপরীত দিকে লাফিয়ে পড়ে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হয়। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে শঙ্কর। দেখে লোকটা এগিয়ে আসে কি না। কিন্তু কেউ এল না। সাবধানে, সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে নারকোল আর সুপুরি গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে যেদিক

থেকে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে সেদিকে এগিয়ে যায় শঙ্কর।

যতই এগোচ্ছে শঙ্কর ততই সাগরের গর্জনধ্বনি জোর হতে থাকে। হঠাৎ সাগরের গর্জন ছাপিয়ে একটা প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসে। বেশ কিছু ওঙ্গী চিৎকার করতে করতে তার দিকেই ছুটে আসছে। ছুটতে আরম্ভ করে শঙ্কর। কোনোরকমে সাগরে ক্যানো ভাসাতে পারলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে সে। রাত থাকতে থাকতে অনেকটা দূরে গেলে আর চিন্তার কারণ থাকবে না। তারপর তাদের জাহাজটা খুঁজে নেবে সে।

ওঙ্গীদের চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ ক্রমশঃই জোর হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারে শঙ্কর ওরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে সাগরের দিকে এগিয়ে আসছে। ছুটছে শঙ্কর জোরে, আরও জোরে, প্রাণপনে। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখছে ওরা কতদূরে। হাঁপাতে হাঁপাতে একসময় বসে পড়ে মাটির ওপর। কিন্তু পিছু দিকে চোখ যেতেই গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নারকোল আর সুপরি গাছের ফাঁকে ফাঁকে সার সার মশাল। মশালগুলো এগিয়ে আসছে তার দিকে দ্রুতগতিতে।

॥ ৩৬ ॥

খোকনবাবুর কথায় সকলেই অন্ধকারে ঢাকা ইঞ্জিন ঘরের দিকে তাকায়। কে যেন টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। এগিয়ে যায় ক্যাপটেন। হাতে শুধু একটা টর্চ। টর্চটার তীব্র আলো লোকটার ওপর পড়তেই চমকে ওঠে সকলে। সুরাইয়া!

উন্নির জ্ঞান ফিরে এসেছে। অস্ফুটস্বরে বলে, ও খুনী। ওকে ছেড়ে দিও না। আমি নিজের চোখে দেখেছি ও পাইলটকে খুন করেছে।

গর্জে ওঠে ক্যাপটেন, শয়তান। এতদিন দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি। তোমরা সুরাইয়ার ওপর লক্ষ্য রেখো, আমি এখুনি আসছি।

পৃথনের দিকে একবার তাকিয়েই ক্যাপটেন ছুটে যায় ইঞ্জিন ঘরের দিকে। ঘরে টর্চের আলো পড়তেই ভয়ে শিউরে ওঠে ক্যাপটেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরটা। আর সেই রক্তের স্রোতে ভাসছে পাইলট। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মুখে আতঙ্কের ছাপ। চোখ বন্ধ করে ঘর থেকে পালিয়ে আসে ক্যাপটেন।

ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে সকলে চেয়ে থাকে ক্যাপটেনের দিকে। ক্যাপটেনের দৃষ্টি পৃথনের ওপর। রাগে সর্বাঙ্গ জলছে ক্যাপটেনের। গর্জে ওঠে ক্যাপটেন আবার মার, মার শয়তানটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে পৃথনের ওপর অবিরাম কিল, চড়, ঘুঁষি বৃষ্টি হয়। পৃথন দুহাত দিয়ে বাধা দিতে দিতে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে তোমরা মেরো না। আমি খুন করিনি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ডেকের ওপর পড়ে যন্ত্রণায় কাতরায় পৃথন। দাঁত ভেঙে কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তবু নিষ্ঠুর উন্নি থামে না। ওকে মেরে ফেলতে পারলেই ওর যেন শান্তি।

জ্ঞান হারায় পৃথন। ক্যাপটেন আদেশ করে, ওর হাত পা বেঁধে ফেলে রাখ গুদাম ঘরে। পরে বিচার হবে।

সকলে মিলে টানতে টানতে নিয়ে যায় পৃথনকে।

ক্যাপটেন চিন্তিত মুখে ডেকের ওপর পায়চারি করে। এমন সময় রঞ্জন আসে। রঞ্জনকে দেখেই ক্যাপটেন চিৎকার করে উঠে আবার, শয়তান, সুরাইয়া একটা আস্ত শয়তান। লোকটাকে কি শাস্তি দিই বল তো, রঞ্জন? ও পাইলটকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। ও খুনী।

তাহলে আমাদের ফেরার কি হবে ক্যাপটেন?

সে চিন্তাও আমি করেছি রঞ্জন।

কি ঠিক করেছ, ক্যাপটেন? কে জাহাজ চালাবে?

আমি।

তুমি?

হ্যাঁ, আমি চালাব।

ইঞ্জিনটাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তার আগে পাইলটের লাসটাকে সরাতে হবে। আমি আর ঐ নারকীয় দৃশ্য দেখতে পারছি না। সুরাইয়া, শয়তান, একটা ভিজে বেড়াল।

কিন্তু সুরাইয়া খুন করতে যাবে কেন, ক্যাপটেন? পাইলটকে খুন করে ওর লাভ?

সে কথা পরে ভাবা যাবে। এখন এস লাসটাকে সরাবার ব্যবস্থা করি। এরপর দুজনে ইঞ্জিনঘরে ঢোকে।

॥ ৩৭ ॥

মশাল হাতে এগিয়ে আসছে ওঙ্গীর দল। ভূতের মতো কালো কালো চেহারা। উলঙ্গই বলা যায়। গলায় কচি কলাপাতার নেকলেস্। হাতে পায়ে রূপোর রিং। মাথায় মোরগের রক্ত। আসলে ওরা 'রা-মল'। এই প্রথম চাওরায় যাবে। ওদের কাছে চাওরা পবিত্র স্থান। সঙ্গে বেশ কিছু শূয়োর। কতকগুলো নারকোলও নিয়েছে, ওখানে খাবে বলে। হৈ হৈ করতে করতে সকলে গিয়ে ওঠে ক্যানোয়। অনেকে বিদায় জানাতে এসেছিল। তারা ওদের ক্যানোয় তুলে দিয়ে ফিরে যায়। ওরা চলে যেতেই শঙ্কর বেরিয়ে আসে গাছের আড়াল থেকে। তারপর ছুটতে সুরু করে সাগরের দিকে।

বালির ওপর বেশ কটা ক্যানো রয়েছে। তারই একটা ধরে ঠেলতে চেষ্টা করে শঙ্কর, কিন্তু নড়াতে পারে না ক্যানোট কদিন পেটে ভাল কিছু পড়েনি। দেহের শক্তি সব যেন উপে গেছে। তবু হাল ছেড়ে দেয় না শঙ্কর। ঠেলা দেয় ক্যানোটাকে। নড়ে ওঠে ক্যানোটা একবার। কিন্তু কিভাবে এটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে বুঝতে পারে না শঙ্কর। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এই সময় কিনেম থেকে একটা সোরগোলের শব্দ আসে। কতকগুলো মশাল এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। শঙ্কর বুঝতে পারে ওরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে পাখী উড়ে গেছে। এখন কোনোরকমে ওরা যদি তাকে ধরতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে মারবে। মশালগুলো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

উঠে পড়ে শঙ্কর। ভগবানের নাম স্মরণ করে প্রাণপণ শক্তিতে ক্যানোটাকে ঠেলতে সুরু করে। কপাল দিয়ে বৃষ্টির মত ঘাম ঝরছে। বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা, পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। হঠাৎ নড়ে ওঠে ক্যানোটা আর একবার। তারপর এগোতে থাকে সাগরের দিকে। দেহের শক্তি একটু একটু ফিরে পাচ্ছে শঙ্কর। বাঁচতে হবে, তাকে যে করেই হোক বাঁচতে হবে। জোরে, আরও জোরে ঠেলতে থাকে ক্যানোটাকে।

ওদিকে এগিয়ে আসছে মশালগুলো। তাদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালো কালো, কিম্ভুতের মত বীভৎস কতকগুলো ওঙ্গীকে। ওরা এগিয়ে আসছে সাগরের দিকে।

ধীরে ধীরে সাগরের জলে নামে ক্যানোটা। শঙ্কর ক্যানোর ওপর ওঠে, তারপর অতিকষ্টে দাঁড় টেনে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় গভীর সাগরের দিকে।

ওদিকে মশালগুলো সাগরের পারে এসে জমেছে। ওঙ্গীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। দু, একটা বিচ্ছিন্ন মশাল অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বালির ওপর। হঠাৎ তারই একটা তীর বেগে ছুটে যায় জলের দিকে। একজন ওঙ্গী ওদের ভাষায় চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মশালগুলো এক জায়গায় জড় হয়। বুঝতে পেরেছে ওরা সবকিছু। দ্রুত একটা একটা করে ক্যানো নিয়ে সাগরের বুকে নেমে পড়ে। প্রাণপনে দাঁড় টানছে শঙ্কর। দ্বীপের দিকে তাকাতেই ভয়ে ওর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে থাকে। অসভ্য ওঙ্গীগুলো ক্যানোগুলোকে ঠেলে ঠেলে জলে নামাচ্ছে, এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—। একটার পর একটা ক্যানো নামছে জলে।

॥ ৩৮ ॥

সকাল হতেই ক্যাপটেন ইঞ্জিন ঘরে ঢোকে। ইঞ্জিনটাকে চালু করতে না পারলে মুক্তির আশা নেই। খাদ্য বেশী নেই, তেল ফুরিয়ে এসেছে। আছে সাগরের মাছ। কিন্তু কাঁচা মাছ খেয়েই বা কতদিন থাকা যায়। আর কাপুরুষ ছাড়া কজনই বা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে। করতে একটা কিছু হবেই। উঠে পড়ে লেগে যায় ক্যাপটেন।

রঞ্জন একটা দূরবীন নিয়ে দেখছিল চারদিক যদি কোনও লাইনার, কার্গো বা জার্মান টর্পেডোর সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগুন এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি। হয়তো একটা জাপানী ফ্রিগেটের দেখা মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু না, লাইনার কার্গো দূরে থাক একটা সাধারণ ক্যানোও তার চোখে পড়ল না। হতাশ হয়ে ক্যাপটেনের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় রঞ্জন দেখে ক্যাপটেন ইঞ্জিনঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। মুখে ক্লান্তির ছাপ; গা, হাত, পা, পোশাক পরিচ্ছদে কালির ছাপ। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বলে, হোপলেস রঞ্জন। রোগটাকে ধরতে পারলাম না।

কোনো জাহাজের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম না, ক্যাপটেন।

ইল্ লাক্, রঞ্জন। সবই কপাল।

ঠিক এই সময় স্টোর ইন্-চার্জ এসে খবর দিল ভাঁড়ারে আর এক কনাও চাল নেই।

ভয়, হতাশা আর ক্লান্তি চেপে ধরলো সকলকে। ভাঁড়ার খালি শুনে খিদেও যেন বেড়ে উঠলো প্রবলভাবে।

উম্লি পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল। বলে উঠলো স্বুরাইয়াই যত নষ্টের মূল। লোকটা অপয়া, ক্যাপটেন। ওকে জাহাজ থেকে ফেলে দিলেই সব বিপদ কেটে যাবে।

আমাকে একটু একা থাকতে দাও তোমরা। আমি আর ভাবতে পারছি না।

কিন্তু ক্যাপটেন—

চুপ কর, উম্লি। তুমি তোমার কাজে যাও।

রঞ্জনের তাড়া খেয়ে উম্লি পালিয়ে যায়।

রঞ্জন—

ভয় কি ক্যাপটেন। ব্যবস্থা একটা হবেই।

হোপলেস, রঞ্জন। হোপলেস। ওদিকে উম্লি জাহাজের সকলকে বুঝিয়েছে স্বুরাইয়ার জন্মেই তাদের যত বিপদ। ঐ লোকটাই যত নষ্টের মূল। ওকে সাগরে ফেলে দিলেই বিপদ কেটে যাবে। খালাসীরা তাই বিশ্বাস করেছে। আর বোধ হয় ঠেকানো যাবে না, রঞ্জন। ওরা খেপে গেছে। তোমার, আমার কথা আর শুনবে না। স্বুরাইয়াকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেবে।

ক্যাপটেন! ঐ যে ওরা চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে ওরা সবাই স্বুরাইয়ার ঘরে ঢুকেছে। আমি আসছি ক্যাপটেন।

যা ভাল বোঝ কর। তবে ওরা যখন বিদ্রোহ স্বুরু করেছে তখন তোমার কথা আর শুনবে কিনা সন্দেহ।

এগিয়ে যায় রঞ্জন স্বুরাইয়ার ঘরের দিকে। ও যা আশঙ্কা করেছিল তাই। জাহাজের সবাই জড় হয়েছে স্বুরাইয়ার ঘরে। উম্লি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদেশ করছে। চার, পাঁচজন খালাসী স্বুরাইয়াকে দড়ি দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছে।

বাঁধ, বাঁধ শয়তানটাকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেল।

অনাহারে, অনিদ্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পৃথন। এর ওপর উম্লির অত্যাচারের মা঳া সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

অনুনয় বিনয় করছে সে, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি কিচ্ছু করিনি।

গর্জে ওঠে উন্নি, চুপ কর শয়তান। আর একটা কথা বললেই জুতোর গোড়ালি দিয়ে তোর নাক থেঁতলে দোব।

ক্ষীণস্বরে পুথন বলে, উন্নি, তুই আমায় ছেড়ে দে ভাই। আমি তোকে ক্ষমা করব। আমার সব কিছু তোকে দিয়ে দোব।

বিকট শব্দ করে হেসে ওঠে উন্নি। আমায় ক্ষমা করবে। দেখ শয়তান কে কাকে ক্ষমা করে।

এরপর উন্নি জুতোব গোড়ালি দিয়ে পুথনেব নাকের ওপর বার বার আঘাত করে। লাল, তাজা রক্তে ভেসে যায় পুথনের মুখটা।

থাম, থাম তোমরা।

গর্জে ওঠে রঞ্জন। উন্নি ঘাড় ফিরিয়ে একবার রঞ্জনের দিকে তাকায়, তারপর বিদ্রূপেব সঙ্গে বলে, এই যে ক্যাপটেনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্। ভাইসব ঐ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে। যদি বাধা দেয় তাহলে ওকেও বেঁধে ফেলে ছুঁড়ে দেবে সাগরের জলে। ওদের জন্তেই আজ আমাদের এই দুর্দশা। তোমরা যদি আমার কথা শোন তাহলে আমি তোমাদের মুখে খাবার তুলে দোব, তোমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। রাজী?

সকলে সমস্বরে বলে, রাজী। তুমিই আমাদের ক্যাপটেন। তাহলে ঐ শয়তানটাকে এবারে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সাগরের জলে ফেলে দাও।

উন্নির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে যায়। হৈ হৈ আর চিৎকারে কানে তালা লাগে। রঞ্জন ছুটে ক্যাপটেনকে খবর দিতে যায়।

সর্বনাশ হয়েছে ক্যাপটেন। ওরা বিদ্রোহ সুরু করেছে। জানতাম, রঞ্জন। আমি এইরকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলাম। পেটে দানা না পড়লে ওরা তো খেপে যাবেই। তাহলে উপায়? মনে হচ্ছে সব উন্নির কাজ। জাহাজের স্টোররুম থেকে খাবার চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে। তারই লোভ দেখিয়ে ওদের খেপাচ্ছে। ঐ-যে সুরাইয়াকে এ দিকেই নিয়ে আসছে চিৎকার করতে করতে।

মার, মার শয়তানটাকে।

একজন…চিৎকার করে বলে।

অন্য আর একজন বলে ওঠে, ওর চোখ দুটো উপড়ে নে। ক্যাপটেন ঘর থেকে একটা চাবুক নিয়ে ধীরে ধীরে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তারপর গম্ভীর

স্বরে বলে, আমি ক্যাপটেন। আমি আদেশ করছি সুরাইয়াকে তোমরা ছেড়ে দাও। ও যদি দোষী হয় তাহলে ওর বিচার হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে বিদ্রূপের হাসি। উম্নি চিৎকার করে বলে, ঠেলে ফেলে দে কুকুরটাকে সামনে থেকে।

খবরদার। আর একটা কথা বললে আমি চাবকে তোমাদের পিঠের ছাল চামড়া তুলে নোব।

ক্যাপটেনের হাতে একটা চাবুক। কাঁপছে ক্যাপটেন রাগে। দুজন ছুটে গিয়ে ক্যাপটেনের হাত থেকে কেড়ে নেয় চাবুকটা। তারপর ক্যাপটেনের পিঠে চাবুকের পর চাবুক চালায়। ওদিকে উম্নি, আর একজন খালাসী পৃথনকে টানতে টানতে নিয়ে যায় ডেকের ধারে। রঞ্জন ছুটে যায়। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। লাথির পর লাথি ছোঁড়ে উম্নি রঞ্জনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু রঞ্জন সজোরে জড়িয়ে ধরেছে উম্নির কোমরটা। চিৎকার করে ওঠে উম্নি, এই তোরা সব 'হাঁ' করে দেখছিস কি? সরিয়ে দে কুত্তাটাকে।

ঠিক এই সময় দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসে, ঝক্ ঝক্·· ঝক্··· ঝক্ ·· ঝক্ ··

চিৎকার করে ওঠে ক্যাপটেন, জাহাজ। জাহাজ আসছে।

এরপর ছুটে যায় ডেকের ধারে, তারপর পাগলের মতো চিৎকার করে, জাহাজ, জাহাজ আসছে। শ্যালভেজ শিপ। কাম হেয়ার, কাম হেয়ার।

হাতের রুমালটা ঘন ঘন নাড়ায় ক্যাপটেন। এরপর গায়ের জামাটা খুলে মাথার ওপর নাড়ায়।

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ··ঝক্ ··ঝক্। ছুটে আসছে জাহাজটা তাদের ট্রলারটার দিকে। সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যায় দেখে পৃথনকে ছেড়ে ছুটে আসে উম্নি। তারপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাপটেনের ঘাড়ে। ক্যাপটেনকে ডেকের ওপর ফেলে জামাসমেত হাতটা জুতোর গোড়ালি দিয়ে থেঁতলাতে সুরু করে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে ক্যাপটেন। রঞ্জন ছুটে আসছিল, কিন্তু দুজন খালাসী ওকে ধরে রাখে। চিৎকার করছে ক্যাপটেন, শয়তান উম্নি সুরাইয়াকে তুই সরিয়ে দিতে চাস্। আমি বুঝতে পেরেছি সুরাইয়াই পৃথন। সম্পত্তির লোভে ভাই হয়ে ভাইকে খুন করতে চাস।

বিকট শব্দ করে হেসে ওঠে উম্নি। কিছুক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে বলে, আরও শোন শয়তান, পাইলটকে আমিই খুন করেছি। জাহাজ যাতে নড়তে

না পারে সেইজন্যে। তিরুনালকে শেষ না করে দেশে ফিরলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।

শয়তান। দেশের আইন তোকে রেহাই দেবে না।

দেশ! দেশের আশা ছেড়ে দে কুকুর। তোদের কাউকে দেশে ফিরে যেতে হবে না। কুত্তাকটাকে বাঁধ। তারপর সাগরের জলে ফেলে দে। এটাকে আমিই শেষ করছি।

এরপর উন্নির হাতটা একবার কোমরের কাছে যায়। সেকেণ্ডের মধ্যে হাতটা আবার শূন্যে উঠে। চক্ চক্ করে ওঠে একটা ইস্পাতের পাত।

ভয়ে শিউরে ওঠে রঞ্জন। দুচোখ বন্ধ করে চিৎকার করে, উন্নি—, শয়তান।

শয়তান, যা তোর শঙ্করের কাছে।

গুড়ুম। গুড়ুম। গুড়ুম।

ইস্পাতের পাতটা নেমে আসতে আসতে থেমে যায়।

ছিটকে পড়ে সেটা ডেকের ওপর। অবাক হয়ে যায় সকলে। পিছু ফিরে তাকাতেই চক্ষুস্থির। ডেকের ওপর কজন জাপানী ফৌজ। তাদের সামনে শঙ্কর।

উন্নিকে ঠেলে দিয়ে ক্যাপটেন ছুটে যায় শঙ্করের দিকে। তাকে জড়িয়ে ধরে বলে শঙ্কর, মাই শঙ্কর, য়্যু আর এলাইভ। মে গড ব্লেস য়্যু মাই ফ্রেণ্ড।

ভগবানকে ধন্যবাদ, ক্যাপটেন আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। আর একটু দেরী হলে যা ঘটত সে কথা ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

উন্নি সাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে ধরে বেঁধে ফেলে জনা চারেক জাপানী সেনা। তারপর উন্নিকে স্টোররুমে পুরে রাখা হল। পৃথনের বাঁধন খুলে ফেলা হল। মুক্তি হল রঞ্জনও। জাপানী ফৌজের ভয়ে কেউ আর একটা কথাও বলতে সাহস করল না। তাছাড়া খালাসীরা উন্নির আসল চরিত্রটা বুঝতে পারছিল একটু একটু করে।

ক্যাপটেন জাপানী ফ্রিগেটের ক্যাপটেনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল, কিন্তু ফ্রিগেটের ক্যাপটেন বলল, য়্যু আর আওয়ার ফ্রেণ্ডস্। য়্যু আর অব ইণ্ডিয়া, অব বোসেস ল্যাণ্ড। তোমরা আমাদের বন্ধু। তোমরা ভারতের, বোসের (নেতাজী) দেশের লোক।

এরপর ক্যাপটেনের মুখ থেকে সব কাহিনী শুনে ওদের এক্সপার্টকে

ইঞ্জিনরুমে পাঠাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে উঠলো ইঞ্জিনটা। তারপর ফিরে গেল জাপানী ফ্রিগেটটা।

আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে জাহাজে। উন্নির চুরি করা খাদ্যসম্ভার বেরিয়ে পড়ল। নিঃসন্দেহে ঐ খাদ্যে আরও কিছুদিন চলে যাবে। সেদিন আর বাড়ির পথ ধরল না ট্রলারটা। ঠিক হল রাতে শঙ্করের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা হবে। সকালবেলায় ভিজাগাপত্তমের দিকে জাহাজ ছুটবে।

শঙ্করের কাহিনী বেশ মন দিয়েই শুনছিল সকলে। শঙ্কর বলল, দিগ্বিদিক-জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগল ক্যানোটা। আর একটু হলেই ধরে ফেলত ওঙ্গীরা কিন্তু ভাগ্য ভাল জাপানী ফ্রিগেটটার দেখা পেয়ে গেলাম। ক্যাপটেন ভাল লোক। আমাকে তুলে নিল সঙ্গে সঙ্গে। আমার মুখ থেকে সব শুনে ট্রলারটাকে খুঁজে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। এরপর সবই তোমাদের জানা।

॥ ৩৯ ॥

পরদিন খুব ভোরেই চারখানা জাহাজ এসে থামল ট্রলারের কাছে। জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। উঠে আসে ক্যাপটেন। মনে ভয়, বোম্বেটেরা জাহাজ আক্রমণ করল নাকি। জার্মান সাবমেরিন হলেও রক্ষে নেই। শত্রুপক্ষের জাহাজ ভেবে গুলি করতে পারে। ডেকের ধারে এসে দাঁড়ায় ক্যাপটেন। এরপর আসে রঞ্জন, খোকনবাবু, শঙ্কর একে একে সবাই। কিন্তু জাহাজগুলোকে দেখেই ক্যাপটেন বুঝতে পারে ওগুলো বোম্বেটের জাহাজ নয় বা যুদ্ধ জাহাজও নয়। ওদের দুটো নরওয়ের হোয়েলিং ফ্লীট্, অপরদুটো হোয়েল ক্যাচার। তবে কোন্ দেশের বোঝা যায় না। ক্যাপটেন ওদের কাছ থেকে জানতে পারে যে ওরাও এসেছে তিমিঙ্গিলের সন্ধানে। সবকিছু শুনে ওরা বুঝতে পারল তিমিটা কাছাকাছিই আছে এরপর যুক্তভাবে অভিযান চালান হল। ঘিরে ফেলা হল সাগরের বেশ খানিকটা জায়গা। বিরাট বিরাট মজবুত ট্রল নিয়ে তৈরী হয়ে রইল সবাই। সকলেরই লক্ষ্য সমুদ্রমানবকে জীবন্ত ধরতে হবে। কিন্তু সেদিন তিমিটার সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে দম ছাড়তে উঠলো তিমিটা। ওর পিঠে দেখা গেল শেওলায় ঢাকা সমুদ্র-মানবকে। হারপুন ছোঁড়া হল না ক্যাপটেনদের নির্দেশে। ওরা ঠিক করল যে করেই হোক ওদের দুজনকে

আলাদা করতে হবে, তারপর সমুদ্র-মানবকে ধরতে হবে ট্রল দিয়ে। পরে তিমিটাকে হারপুন দিয়ে গাঁথলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা পেয়েও তিমিটাকে কিছু করা হল না।

এরপর বেশ কিছু ডুবুরী জীবন বিপন্ন করে সাগরে নামল। তিমিটার গতিবিধি জানতে বা জানাতে আর কিভাবে ওদের আলাদা করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে। ঘণ্টাদুয়েক পরে তিনজন ডুবুরীর সঙ্গে ওপবেব সম্পর্ক ছিন্ন হল। তারা প্রাণ হারাল সাগরের তলায়, তবে তিমিটাই ওদের ঘায়েল করল না অক্টোপাসের মতো কোনো রাক্ষসের হাতে ওরা প্রাণ হারাল বোঝা গেল না। কিন্তু ওরা দমে গেল না! আবার ডুবুরী নামল। বেলা দুটো পর্যন্ত জোর চেষ্টা চালিয়েও কিছু করা গেল না।

ক্যাপটেনেব অনুরোধে শেষে রঞ্জন তার ব্যাথিশেল নিয়ে নামল। কিছুক্ষণ পরেই রঞ্জনের ব্যাথিশেলটা থেমে গেল। সার্চলাইটের তীব্র আলোয় রঞ্জন দেখল ব্যাথিশেলটা একটা পর্বতের মাথায় নেমেছে। সার্চলাইটের অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে সামনে। একটা তবোয়াল মাছ তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। রঞ্জন ফোনের মাধ্যমে ক্যাপটেনকে সব জানায়। ব্যাথিশেলটাও এগিয়ে চলেছে। সার্চলাইটের আলোর পর্দায় ভেসে ওঠে একটা বীভৎস মুখ। সেই তিমিটা। তরোয়াল মাছটা তার সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে চুঁমারে তিমির পেটে। আর যায় কোথা। রাম রাবনের যুদ্ধ। এই সুযোগ। সমুদ্র-মানবটা একটা পর্বতের চূড়োয় উঠে তরোয়াল মাছটাকে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। হঠাৎ তাকে ঘিরে ধরল একটা মজবুত। জাল।

বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করল সমুদ্র-মানব, কিন্তু জালটা তাকে জড়িয়ে ধরল আরও দৃঢভাবে। অসহায় সমুদ্র-মানব। ধাত্রীমায়ের দিকে মমর্স্তাভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে, আর নিষ্ফল আক্রোশে মাঝে মাঝে হাত পা ছোঁড়ে।

বন্দী হল সমুদ্র-মানব। হোয়েল-ক্যাচার দুটোর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ও দুটো ব্রিটেনের। তারই একটাতে তোলা হল সমুদ্র-মানবকে। একটা ঘরে আটকে রাখা হল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সবাই দেখতে লাগল সমুদ্র-মানবকে। সকলেই হতবাক। ঠিক মানুষের মতো। অনেকদিন জলে বাস করার জন্যে গায়ে শেওলার মতো কী যেন জন্মেছে। শরীর বেশ মজবুত। প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। ছ'সাতজন মিলে ঘরে নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে

গেছে। মাথার দুপাশ সামান্য উঁচু, অবশ্য বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যাবে।

ছুটে আসে পৃথন। জানলার ফাঁকে মুখ রেখে চিৎকার করে, তিরু-না-ল-, তিরু, আমার তিরু—। ঐ যে কানে চিক্‌চিক্‌ করছে রূপের মাকড়ি। তিরু, আমায় চিনতে পেরেছিস তিরু? আমি। তোর বাবা।

পৃথনের দুচোখ দিয়ে জল ঝরছে। অবাক চোখে সমুদ্র-মানব চেয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ পৃথনের দিকে, তারপর লাফালাফি সুরু করে। কপাট জানলায় আঘাত করে। হাত কেটে রক্ত ঝরছে তবু বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। মানুষের দুর্বোধ্য এক ভাষায় চিৎকার করছে আর দমাদম আঘাত করছে জানলা-কপাটে।

হোয়েল ক্যাচারের ক্যাপটেনের আদেশে সকলে সরে যায় ঘরের কাছ থেকে, কিন্তু পৃথন নড়তে চায় না। ওকে তখন জোর করে ট্রলারে পাঠিয়ে দেওয়া হল চিৎকার করে পৃথন, তিরু, আমার তিরু। ওকে ছেড়ে আমি যাব না, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও।

পৃথনকে ট্রলারে ফেরত পাঠিয়ে হোয়েল-ক্যাচারের ক্যাপট্যান পাইলটকে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল। এবারে এগিয়ে এল শঙ্কর, তিরুনালকে, সমুদ্র-মানবকে ফিরিয়ে দিতে হবে! ও পৃথনের হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ওর ওপর একমাত্র পৃথনেরই অধিকার।

মৃদুহেসে ক্যাচারের ক্যাপটেন বলে, তুমি ভুল করছ ইণ্ডিয়ান। তিমিটা আমাদের ঠাণ্ডা সাগরের। ওদের গায়ে একরকম পোকা হয়। তারই জ্বালায় পালিয়ে এসেছিল এদিকে। ঐ তিমির আশ্রয়ে, ওর বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে সমুদ্র-মানব। ওর ওপর কেবল আমাদেরই অধিকার।

গর্জে ওঠে ক্যাপটেন, প্রতিবাদ জানায় রঞ্জন, কিন্তু ওরা এদের কথায় কর্ণপাত করে না। ধীরে ধীরে হোয়েলিং ফ্লীট আর হোয়েল-ক্যাচারগুলো এগোতে থাকে ব্রিটেনের দিকে। এদের সঙ্গে ওদের ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়ছে। হঠাৎ সেই গান শোনা যায়। চমকে ওঠে সকলে। এ যেন গান নয়' এ বুক ফাটা কান্না।

আয়—,

ওরে আয়—আয়—আয়—

আমি একা—, একা—

নেই প্রাণ—,

নেই মন—

নেই ভালবাসা—

ছুটে যায় ক্যাপটেন পৃথনের ঘরের দিকে। এ নিশ্চয়ই পৃথনের গলা। যা ভেবেছে ক্যাপটেন ঠিক তাই। খেপার মতো পৃথন মাথা ঠুকছে, কাঁদছে আর সেই গানটা গাইছে।

ফুঁসছে সাগরটা। তার গানের সঙ্গে ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। গেয়ে চলেছে পৃথন।

এখানে কেউ নেই,

মানুষ নেই,

ফাঁকা—, সব ফাঁকা—

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সকলের। সাগরটা ফুঁসতে ফুঁসতে ফুলে উঠছে পাহাড়ের মতো। ঠিক যেন একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। তখনও গাইছে পৃথন,

এই সাগর, এই পৃথিবীটা,

সব ফাঁকা—,

তুই আয়—

ফিরে আয়—

ছুটে যাচ্ছে পাহাড় প্রমাণ ঢেউটা হোয়েলিং ফ্লীট আর হোয়েল-ক্যাচার-গুলোর দিকে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় ঘটে যায়। পাহাড় প্রমাণ ঢেউটা আছড়ে পড়ে সেই হোয়েল-ক্যাচারটার ওপর যার মধ্যে বন্দী আছে সমুদ্র-মানব। নিমেষের মধ্যে তলিয়ে যায় হোয়েল ক্যাচারটা সাগরের অতল জলে।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁদছে পৃথন। এগিয়ে আসে শঙ্কর পৃথনের কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, ঘরে চল পৃথন।

তিরুনাল—, আমার তিরু?

ও সাগরের। সাগর থেকে উঠেছিল, আবার সাগরে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ট্রলারটা হোয়েলিং ফ্লীট আর হোয়েলিং ক্যাচারটার কাছ থেকে সরে যায় দূরে, বহু দূরে।

পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। দেশে ফিরে উন্নি শুনল পুন্নন আর তার একমাত্র ছেলে কুঞ্জন আগুনে পুড়ে মরে গেছে। কে বা কারা রাত্রের অন্ধকারে ঘরে আগুন লাগিয়েছিল তা বুঝতে পারা যায় নি। উন্নি মনের দুঃখে আদালতে সব খুলে বলল। বিচারে উন্নির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। যেদিন রায় বের হল সেদিন ক্যাপটেনও ছিল আদালতে। উন্নির কাছে গিয়ে ক্যাপটেন শুধিয়েছিল, উন্নি, গংগলুর কি হল বলতে পারিস ?

উন্নি ঘাড় হেঁট করে বলেছিল, জানি না ক্যাপটেন বিশ্বাস করুন, ওকে আমি খুন করিনি।

এরপর কতদিন কতবার ক্যাপটেন জাহাজের প্রত্যেককে শুধিয়েছে গংগলুর কথা, কিন্তু কেউ উত্তর দিতে পারেনি। শেষে সকলেই ভাবল জাহাজ থেকে সাগরের জলে পড়ে গংগলুর মৃত্যু হয়েছে।